KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication —
Collection : KLMLGK	Publisher : —
Title জয়শ্রী	Size 7"x9" 17.78x 22.86 c.m.
Vol. & Number ১০/৫	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৪৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : —	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দশম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৮ | ৫ম সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রেণীবাদ

অনিল চন্দ্র রায়

সাহিত্য নিয়েও আজ তর্ক উঠেছে। যেমন তর্ক উঠেছে জীবনের অন্যান্য সব কিছু নিয়ে। এ তর্কটা হলো আরো একটা বড়ো তর্কের অংশ মাত্র। সেই আসল তর্কটা হলো মানুষের জীবন সম্বন্ধে, মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে। তর্কটা প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ সংশয় ও প্রশ্নও প্রখর হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রই আজ প্রশ্নের দ্বারা আকীর্ণ; সর্বত্রই আঁকা রয়েছে বড় বড় অগণিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন যাকে ওয়েল্‌স্ সাহেব বলেছেন এ যুগের মশার ঝাঁক, 'mosquitoes of modern world'. এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করেছে এবং প্রশ্নের মশকদংশনে আমরা আজ সংশয়বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছি,—'now they swarm on every path and infect us with a fever of doubt,' (Wells) এই তাড়নায় আমরা আরম্ভ করেছি বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এরই ফলে ঘটছে আমাদের আদর্শের দ্রুত রূপান্তর। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে গড়তে চাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ আছে। এবং মতভেদ থেকেই দলতেদের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজনীতি ও রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ আজ সাহিত্যেও এসে পড়েছে, কারণ সাহিত্য সমাজনীতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিককেও তাই পলিটি-শিয়ান ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে বিতর্কের আসরে নামতে হয়েছে।

জয়শ্রী

কথা উঠেছে সাহিত্যের মূল্যবিচার নিয়ে, সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে। একদল বলছেন সাহিত্যের কারবার হলো ব্যক্তি নয়, সমষ্টির জীবন এবং সাহিত্য হলো সমাজ-বিপ্লবের যন্ত্র মাত্র। কথাগুলো পুরাণো নয়, এবং অনেকেই ইতিপূর্বে একথা বলেছেন। কিন্তু একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে একদল আজ কথাগুলো বলছেন। এরা হলেন মার্ক্সবাদী এবং একটা স্পষ্ট সমাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে এরা সর্বত্র দল গঠন করেছেন। এই দল একটা বিশিষ্ট মানদণ্ডে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনকে বিচার করে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধেও এদের একটা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে এবং এ সিদ্ধান্ত তাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদেরই একটা প্রয়োগ বই আর কিছু নয়। মার্ক্সীয় সাহিত্য মানেই হলো মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব, এবং সে সাহিত্যের বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বকেই বিচার করতে হবে। এ বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব যেমন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি মার্ক্সীয় সাহিত্যও প্রতিপন্ন হয় একদেশদর্শী বলে।

মার্ক্সীয়দের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে। ব্যক্তির সুখদুঃখ, ব্যক্তির জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তা এই মতে অপাংক্তেয়। ওরা বলছেন, এ যুগের সাহিত্য হবে সমষ্টির ব্যাপক ও বহুজনীন সুখদুঃখ নিয়ে। আর এ সমষ্টি বলতে মার্ক্স-বাদী বোঝেন একটি বিশেষ ধরণের সমষ্টিকে; মানে, শুধু কিষাণমজুরের গোষ্ঠীকে। এই হলো মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ; সমাজ দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত, একদিকে ধনিক এবং অন্যদিকে কিষাণ-মজুর। সভ্যতার ইতিহাসই হলো এই দুপক্ষের লড়াইর ইতিহাস; যে যুগে যে পক্ষ প্রবল হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে দখল করে সেই বিজয়ী প্রবল পক্ষই সেই যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন্ পক্ষ বিজয়ী হবে তাও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তদানীন্তন অর্থনৈতিক শক্তিসংঘাতের দ্বারা। কাজেই (১) অর্থনীতিই মানুষের ও সমাজের প্রেরক ও নিয়ন্ত্রক (economic determinism), (২) অর্থনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণীদ্বৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে (class dichotomy), (৩) বর্ত্তমান যুগ হলো ধনিকপ্রতিপত্তির যুগ; বুর্জ্জোয়া শাসন, সভ্যতা ও সাহিত্যের যুগ, এ যুগে কিষাণমজুরের জিহাদ শেষ হবে ধনিকের মহতী বিনষ্টিতে এবং কিষাণমজুরের অনিবার্য বিজয়ে (inevitability of classless society) (৪) অনিবার্যতার প্রমাণ ও গ্যারাণ্টি হলো হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি। (৫) এই নীতির ফল হবে বর্ত্তমান কালের বিলীয়মান বুর্জ্জোয়া বা ধনিক সাহিত্যের (ও সভ্যতার) পরিবর্তে উদীয়মান শ্রেণীর (কিষাণমজুরের) শ্রেণী-সাহিত্য বা প্রলেটারীয় গণ-সাহিত্যের অসপত্ন প্রতিষ্ঠা (decadence of bourgeois & the rise of proletarian literature). এই পাঁচটি সিদ্ধান্তকে ছেঁকে চুম্বক আকারে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য দাঁড়াল এই যে কেবল মাত্র কৃষাণ মজুরের শ্রেণী-জীবনকে নিয়েই চলবে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টি। কিংবা কিষাণমজুরের স্বার্থের দিক থেকে যে সাহিত্য রচনা হবে তাই হবে সত্যিকার যুগসাহিত্য।

এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধটি নিতান্ত কাল্পনিক বই কিছু নয়; এদের পরস্পরের যোগাযোগটী অতি নিবিড়, এবং একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এরা চিরকাল জড়াজড়ি করে আছে। তাছাড়া এদের পরস্পরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তো নেই-ই, বরং এককে বাদ দিয়ে অপর ক্ষণকালও বাঁচতে পারে না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা চিরকপ্রস্থ ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে আসছে সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরে। সেই ভারসাম্যটীর বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজজীবনে ঘটে বিপ্লব। সামাজিক ক্রমবিকাশের একটী গতি আছে, সেই গতিমুখে কখনো কোনো দিকে আতিশয্য হলেই ভারচ্যুতি ঘটে থাকে। তাই কোনো যুগে ব্যষ্টির ওপরে পরে জোর, ব্যক্তিবাদ হয় প্রবল; কোনো কালে সমষ্টির ঘটে প্রাবল্য, গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায় প্রধান। ১৯ শতকে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ চরমে উঠেছে, যার ফলে ধনতন্ত্র ও স্বার্থপূজার জয়জয়কার আরম্ভ হয়েছে। আজ তার প্রতিক্রিয়ার মুখে সমাজতন্ত্র এসেছে, এসেছে সমষ্টির ডাক; অবাধ ব্যক্তিপ্রাধান্যকে খর্ব করবার রব উঠেছে চারদিকে। ব্যক্তিকে টিপে মারতে হবে, কারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ আসামী, সভ্যতা ও সাহিত্য উভয়েরই আদালতে। তাই আজ কম্যুনিষ্ট চান এমন সাহিত্য যেখানে ব্যক্তির স্থান নেই, যেখানে শ্রেণীরূপী সমষ্টির হবে ষোড়শোপচার পূজা। কিন্তু চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদী হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ এবং আতিশয্য দোষে তার সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে একদেশদর্শী। তবে মার্ক্সীয় মতবাদের কোন স্থায়ী, প্রামাণ্য ব্যাখ্যান নাই; মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদীদের মধ্যেও নানা মুনি আছেন। তবে যারা গোঁড়া সম্প্রদায় তাদের কথাই এখানে হচ্ছে। মিঃ আপওয়ার্ড (Upward) (১), মিঃ রালফ্ ফক্স (Ralph Fox) (২), মাইকেল গোল্ড (Michael Gold), মিরস্কী (Mirsky) ক্রিস্টোফার কড্ওয়েল (Christopher Caudwell) (৪) গ্রেনভিল হিক্স (৫) ইত্যাদি লেখক এই গোঁড়া শ্রেণীবাদের সমর্থক। এঁদের মতে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোনো মূল্য নাই, শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই তার অস্তিত্ব ও ব্যবহারের অর্থ আছে। এঁদের এই গোঁড়ামী ও আতিশয্য হলো ১৯ শতকীয় ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরা বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিকে চোখ বন্ধ করে আছেন। মানুষের মন যে একটী জটীল মিশ্র সত্তা, তার মানসিকতা যে নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে বিচিত্র ও বহুরঙীন একথা এঁরা ভুলে যান। মানুষের ওপরে তার অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে, একথা ঠিক। জীবিকা অর্জ্জনের সূত্রে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক নিজের চারদিকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজন ও তাগিদ তার মনকে ও ব্যবহারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু শ্রেণী-প্রভাব ছাড়াও বহু বিচিত্র অবস্থার প্রভাব তার ওপরে অহরহ কাজ করছে; যেমন তার বংশ, রক্ত ও দৈহিক উত্তরাধিকার (race), যেমন তার

(1) "The mind in chains" by Upward. (2) "The Novel and the People" by Ralph Fox. (4) "Illusion and Reality"—by Christopher Caudwell. (5) "The great tradition"—by Grenville Hicks.

দেশ ও কাল, তার পুরুষ-ও-স্ত্রীত্ব বা লিঙ্গভেদ (sex), তার পরিবার-গত স্থান ও পদ-মর্যাদা (status), তার ধর্ম ও জাতি (caste)। সে কেবল ব্যবসায়ীই নয়, ধনিক ও শ্রমিকই নয়; মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো রক্ত তার মধ্যে আছে, তার প্রভাব আজ জনন-শাস্ত্র (genetics) স্বীকার করবে; সে পুরুষ কি নারী তারও প্রভাব তার মানসিক গড়নকে অনুরঞ্জিত করবে, একথা যৌন শাস্ত্র আজ বলবে; সে পিতা কি ভ্রাতা কি স্বামী, মাতা কি জায়া কি কন্যা এই পারিবারিক সম্পর্ক-জালের চাপও তার চেতনাকে কিছু অভিভূত করবে, একথা মনস্তত্ব অস্বীকার করে না; সে নাস্তিক কি আস্তিক কি ফেটীশ-পূজক, তান্ত্রিক কি ইহুদী কি বৈষ্ণব, এসব ব্যাপারের প্রভাবও কম নয়, সমাজতত্ব একথা স্বীকার করবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব মিশ্র পদার্থ, তাকে কেবল একটা দিক থেকে, একটা cross section হিসেবে দেখলে, সে দেখা আংশিক ভাবে সত্য হবে। কেবল ব্যবসায়গত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বের সবটুকু ধরা পড়ে না। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের একটা দিক আছে। রাসেল বলেছেন, যার দাঁত ব্যথা হয় সেই জানে ব্যথার অনুভূতিকে; এ তার একান্ত নিজস্ব; এখানে প্রত্যক্ষ ভাগ দেবার উপায় যেমন নেই, এখানে অন্য কারুর ভাগ নেবারও পথ নেই। গোলাপ দেখে বা সূর্যাস্ত দেখে যে আনন্দের উপলব্ধি কারুর হয়, তা তারই বিশিষ্ট উপলব্ধি। বাইরের সমাজের সঙ্গে, অপরাপর মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক না এক সূত্রে যোগ আছে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সঙ্গে সকল যোগসূত্রের বাইরে একটী নিরালা অন্তর্লোক আছে যেখানে অপরের প্রবেশপথ নেই। সেখানে মানুষ একক। বাহির ও ভিতর, এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ। এদের একে অন্যের উপরে সততই প্রভাবপাত করছে, এই অন্যোন্যতাকে স্বীকার করেও ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সত্বার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ অপর দ্বীপ বা দেশ থেকে পৃথক, সমুদ্র তাদের মধ্যে অন্তরাল রচনা করে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র আবার, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে, দুইয়ের মধ্যে যোগসেতু হিসেবেও রয়েছে। সমুদ্র ব্যবধানও বটে, সংযোগও বটে। তেমনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার সমষ্টির অন্তর্ভুক্তি ও সংযোগ। মানুষ যেমন একক ও পৃথক, তেমনি মানুষ বহুর সহযোগী এবং সমাজেরও অংশীদার। ব্যক্তির সুখদুঃখও যেমন সত্য, তেমনি সমষ্টিজীবনের সাধারণ সুখদুঃখও সত্য; ব্যক্তি নানা ক্ষেত্রে নানা লোকের সঙ্গে সমান সুখদুঃখের ভাগী; সেই কারণে বহুতর লোকের সঙ্গে ব্যক্তির গোষ্ঠীবন্ধন ঘটে, এবং ব্যষ্টি তাই বিবিধ গোষ্ঠী-জীবনের (group life) অন্তর্ভুক্ত, ফলভাগী এবং প্রভাব-লালিত। তার বিবিধ সম্পর্ক-বন্ধনের মধ্যে কেবল জীবিকাসম্পর্কিত সম্বন্ধ ও সংযোগই তাকে মাটীর ঢেলার মত ষোল আনা গড়ে তুলবে, একথা কোন বিজ্ঞানই সমর্থন করে না। কারণ এ হলো নিছক একদেশ-দর্শন মাত্র এবং যাকে বলে 'over-simplification' সেই আতিশয্য দোষেরই নামান্তর।

সাহিত্য কেবল মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্রেরই প্রকাশ মাত্র, একথা এই এক-দেশদর্শী গোঁড়ামী বই আর কিছু নয়। মানুষের মনোভাব তার শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সত্য। কিন্তু সে কতটুকু? তাছাড়া সেই প্রভাবকে অপরাপর স্বার্থ, তাগিদ ও প্রভাব খর্ব এবং এমনকি, বিলুপ্তও করতে পারে। কেন পারে তার জবাব দিয়েছে সমাজতত্ব। সমাজে ও জীবনে বিবিধ শক্তি ও স্বার্থ কাজ করছে, ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে এই বিচিত্র ও অসংখ্য শক্তিসমূহের সমবেত ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত। এই পারস্পরিকতা (reciprocity) হলো অদ্যকার সমাজতত্বের সর্বস্বীকৃত তথ্য। মার্ক্সীয়দের অর্থনৈতিক শ্রেণীবাদ দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের সামাজিক ক্রমবিকাশবাদের ওপরে। এই বিবর্তনবাদের ভিত্তি হলো একরৈখিক (unilinear), অপরাবর্তনীয় (irreversible) কার্যকারণক্রমের থিওরী যা' আজকার দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচল। অর্থনীতি যেমন জীবনের অপরাংশকে প্রভাবিত করছে, অপরাংশগুলোও তেমনি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ সাহিত্যে থাকবে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সকল রকমের গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থই সাহিত্যের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হবে, একথাও অনস্বীকার্য। অধিকন্তু কেবল গোষ্ঠীজীবনই নয়, ব্যষ্টি-জীবনেরও আশানিরাশার কাহিনী সাহিত্যে ভাষা পাবে। সমষ্টিজীবন দানা বেঁধে উঠেছে ছোটবড় নানাবিধ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। ছোট বড় নানা আকারের সমকেন্দ্রিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্যক্তির একটী স্বতন্ত্র সত্বা আছে। তাই আজ মার্ক্সীয়দের মধ্যে যারা যুক্তিশীল তারা ব্যক্তিকে নিয়েও সাহিত্য হতে পারে একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত মার্কস্‌বাদী জন্ ষ্ট্রাচীও (strachey) বলছেন, "Literature, for the most part, attempts to illuminate some particular predicament of a particular man or a particular woman at a given time and place." এই স্বীকৃতির জন্য গোঁড়া মার্ক্সীয়রা খুশী হননি। এমনকি গ্রেন্‌ভিল্ হিক্স্ এর জন্য ষ্ট্রাচীকেও এক হাত নিতে ছাড়েননি। কিন্তু আমেরিকার আর একজন মার্ক্সীয় সাহিত্যিকও ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকার করে ষ্ট্রাচীকে সমর্থন করেছেন। তার নাম ফ্যারেল (J. T. Farrell). তিনি বলছেন, সামাজিক শক্তিগুলো এমন ভাবে দানা বেঁধে উঠে কাজ করেনা যাতে এক একটা বিপুল আকারের পিণ্ড বিরুদ্ধ দিক থেকে এসে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে। মানুষকে কেবল পিণ্ডের অংশ হিসেবে দেখলে আবার পুরোণো যান্ত্রিকতারই সমর্থন করা হয় —"the treatment of them as such is a fall back to the materialism that preceeded Marx........We cannot treat social forces as mechanical and the basis of this is the common intellectual conception of cause and effect as rigidly opposite poles." (৬) ফ্যারেলের মতে সাহিত্য শ্রেণীকে নিয়েও হতে পারে, ব্যক্তিকে

(৬) "A note on Literary criticism" by James T. Farrell.

নিয়েও হতে পারে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল্য যে কম একথাও স্বীকার্য নয়। উপন্যাসের শ্রেণীভাগ করে হিক্‌স্ যে "সমষ্টি-কেন্দ্রিক" উপন্যাসের নামকরণ করেছেন তাও ফ্যারেলের মতে অবৈজ্ঞানিক। (৭)

জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যা দুইই স্বীকার করে থাকে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি প্রভেদ-ও আছে। কোনো কোনো বিষয়ে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে আবার অন্যদিক থেকে থাকে অসাদৃশ্য। জীবিকা-স্বার্থের সাদৃশ্য যাদের মধ্যে রয়েছে তারা হলো মার্ক্সীয় "শ্রেণী"। তেমনি অন্যবিধ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্যরকমের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবল এক ধরণের সাদৃশ্যটীকেই চোখের ওপরে রেখেই সাহিত্য সৃষ্ট হবে, কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্বার্থ নিয়েই সাহিত্য গড়ে উঠ্‌বে, এ দাবি ও কল্পনা ভিত্তিহীন। আরেকটা কথা আছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির একটা প্রভেদও আছে; সকল সাদৃশ্যের পিছনেই জেগে রয়েছে এই প্রভেদ বা অসাদৃশ্য। এইদিক থেকে দেখলে প্রত্যেকটী ব্যক্তিরই আছে একটী বিশিষ্টতা বা uniqueness. এইখানে প্রত্যেকটী ব্যক্তি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও রীতিতে, উভত্রই, এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। আকৃতিতে যেমন প্রতিটী ব্যক্তি প্রতি ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন, প্রকৃতিতেও তাই প্রতি মানুষের একটী পৃথক স্বকীয়তা আছে। (৮) এই কারণে মোটা-মোটি ভাবে শ্রেণী হিসেবে কোন মানুষ-সংহতির ব্যবহার সদৃশ ও সমপ্রকৃতিক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোন ব্যষ্টির ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ-বাচন চলে না। ব্যক্তির প্রায়শই বিশিষ্ট-প্রকৃতি ও স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে statistical average'এর পদ্ধতি খানিক দূর কার্যকরী হলেও, বেশী দূর নয়। যেখানে মানুষ স্বতন্ত্রধর্মী সেখানে তার ব্যবহার শ্রেণী-ব্যবহার না হয়ে হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিক ব্যবহার যা স্বকীয় বৈশিষ্টে স্বয়ংসিদ্ধ। এই ব্যক্তি-

(7) "Therefore, because a novel happens to deal with the particular predicament of a particular man or woman···it does not necessarily follow that it is tainted with individualism, nor, because it is tainted with individualism, does it necessarily follow that it belongs in a lower category than the collective novel ;·····Actually there is nothing astounding in the fact that novelists are likely to go on writing about the individuals, because, after all, the world is made up of individual human beings."—(ibid, pp. 111-112).

(8) "Besides being members of classes and groups, they are intractable individual entities, each uniquely different and in some respects, from every other human being on this planet.·····In other words, in every individual there is an aspect of uniqueness and intractability and this makes him not completely predictable in every potential situation." (ibid, pp 117).

ধর্মকে নিয়ে যে সাহিত্য-রচনা হয়, তার শ্রেণীস্বার্থ-সম্পর্কিত মূল্য কম হলেও সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ব্যক্তি হিসেবে বা মানুষ হিসেবে সাদৃশ্য আছে; শ্রেণী-স্বার্থের পার্থক্যকে বাদ দিয়ে যদি মানবীয় সাদৃশ্যকে মাত্র ভিত্তি করে সাহিত্য তাকেই রূপ দেয়, তবে সে সাহিত্যকে কুসাহিত্য বলবার কোনই যুক্তি নেই। কিষাণ আর জমিদারের, মজুর আর ধনিকের মধ্যে মানুষ হিসেবে কতকগুলি সমধর্ম আছে। বৃহত্তর গণের (genus) মধ্যে ক্ষুদ্র জাতি (species) অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে; জাতি হিসেবে পরস্পরের বিরোধ বা প্রভেদ থাকলেও সবগুলি ব্যক্তিই গণ হিসেবে বৃহত্তর মানবসমাজের অংশ। দাম্পত্য-প্রীতি, বাৎসল্য-প্রেম, আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মানুষ বিরোধী শ্রেণীভুক্ত হয়েও সমস্বভাব হতে পারে। এই বিশ্বমানবিক মানবধর্মও সাহিত্যের অনবদ্য বিষয়বস্তু হতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রাম এই মানবধর্মকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে না। (৯)

যারা শ্রেণী-সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছেন তারাও এক ধরণের রোমান্টিক ভাবপ্রবণতার মোহে আটকা পড়েছেন। তবে তাদের এই মত্ততা আজ কিষাণমজুরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, এই যা তফাৎ। কোনো সাহিত্যে রাজরাজড়াদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়; কিংবা ধনীদের বিলাস-ঐশ্বর্যের সসম্ভ্রম বর্ণনায় সাহিত্য প্রায়শঃই মুখরিত হয় এ-ও দেখা যায়। কিন্তু মার্ক্সীয় সাহিত্যিকদের আধুনিক রচনায় দরিদ্রের, এমন কি দারিদ্র্যের সপ্রশংস স্তুতিবাচনে আজ রোমান্টিক ভাবালুতারই অন্য রূপ দেখা দিয়েছে। এ সেই সংকীর্ণ বাতিক যা সব জটীলতাকে সরল ফর্ম্মুলায় বেঁধে সহজ সাহিত্য সৃজন করতে চাইছে; সাহিত্য হলো মানব-মননার দিগন্ত-প্রসারী অরণ্য; এখানে আলোতে-ছায়াতে, লতাপাতা-পল্লবে, কীটপতঙ্গজন্তুজানোয়ারে, কণ্টকে-ফুলে-ফলে, মেঘবর্ষণে আর তুফানে-বিদ্যুতে অজস্র জটীলতা। একে সংক্ষিপ্ত নির্যাসে পরিণত করতে চান এরা, দারিদ্র্যের ঘর্মজলে আর বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু এ যুগ-সাহিত্য হবে না, এ হবে সহজিয়া ভাব-সাহিত্য ('literature of simplicity'); এই নব রোমান্স রচনা করবে কেবল, "songs of 'stench and sweat", "it tends to idealise the worker and the worker-writer". শ্রেণী-সাহিত্যের তিন রূপ হতে পারে, (১) কিষাণমজুর লেখকের রচনা (২) কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা (৩) কিষাণমজুরের স্বার্থের দৃষ্টিভূমি থেকে রচনা, অর্থাৎ কিষাণমজুরের স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা। লেখক কিষাণমজুর হলেও তার রচিত সাহিত্য কিষাণ মজুরের স্বার্থকে সমর্থন না-ও করতে পারে। কেবল কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা হলেই

(9) "The class struggle however does not in any sense produce so complete a differentiation of human beings that there are no similarities between men who objectively belong to different social classes." (ibid 125 pp.)

নয়, তাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা হওয়া চাই। তাই তৃতীয় পর্যায়ের সাহিত্যই সত্যিকার শ্রেণী-সাহিত্য। এই শ্রেণীসাহিত্য এক শ্রেণীর সাহিত্য হতে পারে কিন্তু একমাত্র সাহিত্য নয়। কারণ 'শ্রেণী' নামক সংজ্ঞা বা categoryটী সাহিত্যবিচারে একমাত্র মাপদণ্ড নয়, একথা পূর্ব্বেই বিবৃত হয়েছে। গোঁড়া শ্রেণীবাদীরা অপর সাহিত্যকে স্বীকার করেন না। বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যা' লিখে থাকেন তা যতই বাস্তব ও সত্য হোকনা কেন, তার মূলপ্রেরণা, এদের মতে, স্বার্থসিদ্ধি বই কিছু নয়। জয়েসের লেখায় যে বাস্তব ও অবিকল বর্ণনা আছে তার কারণ হ'লো, মিরস্কির (Mirsky) মতে, জয়েসের অতিরিক্ত ও অন্যায় বস্তু-প্রীতি বা সম্পত্তি-প্রীতি। জয়সের বাস্তবতার কারণ নাকি জয়সের লুব্ধ ক্যাপিটালিষ্ট মনোবৃত্তি। এরই নাম মার্ক্সীয় সাহিত্যসমালোচনা! আঁদ্রে জিদ্ (Andre gide) একজন নামকরা মার্ক্সীষ্ট্। ১৯৩৫ সালে তিনিও লিখেছিলেন, সকল শ্রেণীকে অতিক্রম করে সকল শ্রেণী-স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান আছে সত্যিকারের সাহিত্যের। (১০) হেনরী হ্যাজ্‌লিট্ (Henry Hazlitt) আমেরিকার নামজাদা সমালোচক। তিনিও সাহিত্যে এই শ্রেণীমত্ততার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি ট্রট্স্কী পর্যন্ত বলেছেন, "Personal lyrics of the smallest scope have an absolute right to exist within the new art." ব্যক্তির অনুভূতি নিয়ে অনুপম সাহিত্য হয়েছে, এবং চিরদিনই হবে। শ্রেণী সত্য, শ্রেণী-প্রভাবও সত্য কিন্তু শ্রেণীকে অতিক্রম করে মানুষ উর্দ্ধলোকে উঠতে পারে, যে লোকে মানুষ কেবল শ্রেণী নয়, দেশ, কাল, জাতি, লিঙ্গ ও বংশ ইত্যাদি সকল গণ্ডীর বন্ধন ও সংস্কারের অতীতে স্থিতিলাভ করতে পারে। একথা হ্যাজলিট্ও স্পষ্টভাষায় বলেছেন। (১১) মার্সেল প্রুস্তের লেখা ফরাসী পরিবেশের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বাস করলে তার লেখার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ হতোই। কিন্তু তাই বলে প্রুস্ত্-'এর ফরাসীত্বের দরুণ কি আমেরিকার পাঠকদের কাছে প্রুস্ত'এর সাহিত্যিক মূল্য কমেছে কিছু? ড্রেজার (Dreiser) পুরুষ বলে মহিলাদের কাছে তার লেখা কিছু কম প্রিয় নয়। তেমনি জর্জ্জ ইলিয়াট বা দেলেদ্দার লেখা পুরুষেরা পড়বে না এমন হতে পারে না। অর্থাৎ শ্রেণী, লিঙ্গ, দেশকালের উর্দ্ধে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে সাহিত্যিক রসের অব্যাহত থাকবার কোনই বাধা হয় না।

(10) "In every enduring work of art……one that is capable of appealing to the appetite of successive generations, there is to be found a good deal more than mere response to the momentary needs of a class or a period."—Andre Gide.

(11) "The great writer with great imaginative gifts may universalise himself. If not in a literal sense, then certainly in a functional sense, he can transcend the barriers of nationality, age and sex. But centainly he can, in the same functional sense and to the same degree, transcend the barrier of classes" (H. Hazlitt in an the article in 1932).

শ্রেণীর প্রভাব বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে শ্রেণীকেই সাহিত্যবিচারের একামেবাদ্বিতীয়ম্ মানদণ্ড করে দাঁড় করানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। ইতিপূর্বে অর্থাৎ মার্ক্সীয় সাহিত্য সৃষ্ট হবার আগেও সমালোচকেরা পারিপার্শ্বিকের ও এমন কি, শ্রেণীর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুরথোপ্ (Courthope) তার বিখ্যাত এক প্রবন্ধে ("Poetry and the people") শ্রেণী-প্রভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন। (১২) এমন কি, বুর্জোয়া উদারনীতির বর্তমান বিশৃঙ্খলা যে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ থেকে জন্মেছে এবং তাই তদানীন্তন কাব্য যে এই বিশৃঙ্খলার ছাপ বহন করেছে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এক কথা, আর তার অন্ধ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হলো অন্য ব্যাপার। মার্ক্সীয় সমালোচনার আতিশয্য দোষ এবং একদেশদর্শিতা তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। এমনকী ট্রট্স্কীও এ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রেণীসংস্কৃতি বলে কোন বস্তু নেই, কাজেই প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলেও আলাদা কিছু থাকবার কল্পনা করবার কোনই অর্থ নেই। যে শক্তি ও আনন্দের উপাদানকে মানুষ যুগে যুগে সঞ্চয় করেছে, সেই সব উপাদানকে কোন বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতি বলে ছাপ মেরে দেবার কোনই কারণ নেই। ইলেক্‌ট্রিসিটি, ষ্টীমএঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রেডিও, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি হলো আধুনিক সভ্যতার উপাদান, এর মূলে বহু লোকের অবদান রয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণে এদের ব্যবহারে ও প্রয়োগে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। তবে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রে রয়েছে; তাই এসব মানব-ব্যবহার্য উপাদান কতিপয় ধনিকের দখলে ও ভোগে আটক আছে। সর্বহারাদের এতে কোন অধিকার নেই। কিষাণ-মজুরের রাজ হলে, এই যুগান্তের ক্রমসঞ্চিত ঐশ্বর্য কিষাণ-মজুরের ভোগেও আসবে। যা ছিলো সংখ্যাল্পের আয়ত্তে, তা হবে অগণিতের উপভোগ্য। যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা আজ এক শ্রেণীর একচেটিয়া, সেই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়বে সকল স্তরের মধ্যে। শুধু এই হবে পার্থক্য। কাজেই "বুর্জোয়া" বা "প্রলেটারীয়" বলে মার্কামারা কোন সংস্কৃতি নেই; এ হলো শব্দের ভ্রষ্ট প্রয়োগ মাত্র। আসল কথা আজিকার বুর্জোয়ার অধিকৃত ও উপভোগ্য সংস্কৃতিকে আমরা চাই প্রলেটারীয়েট'এর দখলে এনে দিতে। অনাগত বিপ্লব হবে এই হস্তান্তরের বাহক। কাজেই বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতিকে "সমাজতান্ত্রিক"

(12) "All through the history of England we see a tendency in the life of the nation to concentrate itself in…some particular class which becomes for the time being the sovereign power, rallies round itself all the faculties of the people……" (Courthope).

বা "প্রলেটারীয়" সংস্কৃতি নাম দেওয়া একান্ত নিরর্থক। অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিভাষাকে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে অর্থবিভ্রাট ঘটবেই। সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যারা রাজনৈতিক লেবেল দিয়ে খণ্ডিত করে দেখেন তারা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা করেন। ফ্যারেলের ভাষায়, "When one freezes the categories of bourgeois and proletarian and insists that they be standards of measurements in literature, one shuts out the enduring element that Gide speaks of." এঙ্গেল্‌স্ (Engels) মার্ক্সীয় ডায়ালেকটীক জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদে পরিণত করেছেন, "বুর্জোয়া," "প্রলেটারীয়" ইত্যাদি পরিভাষাকেও কাষ্ঠকঠিন, অনড় সংজ্ঞায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে মার্ক্সবাদীরাও "বুর্জোয়া" ইত্যাদি লেবেল ব্যতীত সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সমাজ-জীবনকে ভাবতেও পারেন না। এই গোঁড়ামীর পথ এঙ্গেল্‌স-ই দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথম "প্রলেটারীয় সংস্কৃতি"র কথা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন। কিন্তু এই ধরণের ভাগাভাগি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলে না। বিশেষতঃ যে মনোভাব বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিলীয়মান বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, তা কেবল বিশুদ্ধ অজ্ঞতা বই অন্য কিছু নয়। প্রেলেটারীয় সংস্কৃতি বলে যে নতুন সংস্কৃতির কাহিনী মার্ক্সবাদীরা প্রচার করে থাকেন, তা সোণার পাথর বাটীরই মতন কল্পনার অলীক সৃজন। ট্রট্স্কীর মত গোঁড়া মার্ক্সবাদীও একথা স্বীকার করেছেন। ডিক্টেটরী যুগের অন্তে নতুন সমাজ সংগঠন হবে শ্রেণী-হীনতার ভিত্তিতে। সে যুগের সংস্কৃতি হবে সর্বমানবের সংস্কৃতি, "প্রলেটারীয়" নামক শ্রেণীচিহ্নে লাঞ্ছিত সংস্কৃতি নয়। (১৩) এমন কি মার্ক্স স্বয়ং-ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেণীবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না। তথাকথিত "বুর্জোয়া"-মার্কা বলে মার্ক্স এ যুগের ও পূর্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করেন নি; বরং সাহিত্যকে রাজনৈতিক মতসংঘর্ষের উর্দ্ধে রেখে তিনি অবিমিশ্র সাহিত্যরসাস্বাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। এস্কাইলাস্ (Æschylus), হোমার থেকে দান্তে, সেক্স্‌পিয়ার, সারভেন্‌টে (Cervantes) গ্যয়েটে (Goethe), হায়নে (Heine), ইত্যাদির বইগুলো তাঁর দৈনন্দিন শান্তি এবং সারাজীবনের সান্ত্বনার উৎস ছিল। পল লাফার্গ বলেছেন, মূল গ্রীক ভাষায় এস্কাইলাসের বই মার্ক্স অন্ততঃ

(13) "There is no workers' culture and that there will never be any and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class culture and to make way for human culture ; We frequently seem to forget this. The main task of the proletariat intelligentsia in the immediate future is not the abstract formation of a new culture,.....but definite culture-bearing, ie, a systematic, planful and of course, critical imparting to the backward masses of the essential elements of the culture which already exists." (Trotsky—Literature & Revolution.)

বছরে একবার আগাগোড়া পড়তেন। "বুর্জোয়া" কবিতা-সাহিত্যেই ছিলো তাঁর অফুরন্ত আনন্দ। (১৪) রোমান্সের নামে আমাদের আধুনিক মার্ক্সবাদীরা আৎকে ওঠেন; কিন্তু সারভেন্‌টের ও বালজাকের (Balzac) রোমান্সগুলিকে মার্ক্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন; বালজাকের "La comedie Humaine" এর প্রতি তার প্রশংসা ছিলো অপরিসীম। (১৫) তাছাড়া স্কট্ (Scott) ফিল্ডিং (Fielding) ডুমা (Dumas) ইত্যাদিও তাঁর প্রিয় ছিলো; "Old mortality" এবং দিদেরো'র (Diderot) "Le Neveu de Rameau" কে মার্ক্স প্রতিভাদীপ্ত অসাধারণ সৃষ্টি, masterpiece, বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক মতামতে এরা সবাই মার্ক্সের কাছে ঘৃণ্য reactionary মাত্র, কিন্তু সাহিত্যলোকে এরা তার কাছে নমস্য প্রতিভা। এতেই প্রমাণ হয় যে সাহিত্যবিচারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা judgmentই চূড়ান্ত নয়, মূল্যবিচারে সাহিত্যের আছে নিজস্ব কতকগুলি মানদণ্ড ও আদর্শ। ফ্রান্‌জ্ মেহরিং (Franz Mehring) বলেছেন, "In his literary judgments he was completely free of all political and social prejudices, as his appreciation of Shakespeare and Walter Scott shows.....". লেলিন-পত্নী ক্রুপস্‌কায়ার স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অবসর কালে লেনিনও এই বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও decadent সাহিত্য থেকেই চিরজীবন আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে গেছেন। কিন্তু অদ্যকার মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সের থেকেও বেশী মার্ক্সীস্ট্ এবং লেনিন থেকেও থেকেও বেশী লেনিনিষ্ট। কাজেই 'বুর্জোয়া' বল্‌তেই তাদের উদ্গত বিতৃষ্ণা দমন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাণহীন আড়ষ্ঠ শ্রেণীবাদে এদের বিচার-শক্তি ও উপভোগ-প্রবৃত্তি উভয়কেই পঙ্গু করে ফেলেছে। ক্রুপ্‌স্কায়ার বইয়ে এর শিক্ষাপ্রদ ও আমোদজনক দৃষ্টান্ত রয়েছে। একদল কম্যুনিষ্ট "তরুণ"কে লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা পুশ্‌কিন্ (Pushkin) পড়ো?" জবাবে তরুণ মার্ক্সিষ্টরা বল্‌লেন, "না, না, পুশ্‌কিন্ যে বুর্জোয়া! আমাদের হলো মায়াকভ্‌স্কী।" লেনিন মৃদুকি হেসে বললেন, "আমি কিন্তু পুশ্‌কিনকেই বেশী ভালবাসি!" বেচারি লেনিন! গণ্ডুষ জলে ফরফরায়মান খুঁদে মাছরা চিরকাল এবং সকল দেশেই এই রকমের হয়ে থাকেন। তারা একটু অধিক আতিশয্য ব্যাধিতে ভোগেন। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সমাজে আজ ধনীদরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রাম প্রখর হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যৎ সমাজে কিযাণ

(14) ".....he would read Eschylus again in the original text, regarding this author and Shakespeare as the two greatest dramatic geniuses world had ever known, for Shakespeare he had an unbounded admiration." (Lafargue).

(15) "The greatest masters of romance were for him Cervantes and Balzac....His admiration for Balzac was so profound that....."(Riazanov).

মজুরের স্বার্থকে জয়যুক্ত করে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সংস্কৃতি ও সমস্তসভ্যতাকে শ্রেণীবাদের লোহার ছাঁচে ফেলে মাপতে বা গড়তে হবে, এই Neuveau-মার্ক্সীয় সমালোচনা-রীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একই যাদুদণ্ড দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই সবকিছুর সম্পূর্ণ সমাধান করা চলেনা। একটা সীমা পর্যন্ত এ নীতি কিছুটা কার্যকর হতেও পারে কিন্তু তার পরে এ অদ্বৈতী পদ্ধতি অচল। সমাজ ক্ষেত্রের যে পদ্ধতি বা standard তাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ করার স্বপক্ষে কোনই লজিক নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও আজ মার্ক্সবাদীরা ডায়ালেকটিক ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং "বুর্জোয়া" সাহিত্যের মৃত্যু-দণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু ট্রট্স্কীর লেখনীতেই বেরিয়ে পড়েছে মার্ক্সীয় স্বীকৃতির সত্যভাষণ, "It is very true, one cannot always go by the principles of marxism in deciding whether to reject or accept a work of art." ১৯১৭ সালের পরের জগতে যে সব নতুন ঘটনাবিবর্তন হয়েছে তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হলো এই যে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মার্ক্সবাদীদের সাহিত্যিক গোঁড়ামীর একদিন সংশোধন হবে।

বিচারশীল চিন্তা

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

"স্বাধীন চিন্তা ভাল কিন্তু নির্ভুল চিন্তা আরো ভাল"। কথাগুলো লেখা আছে উপশালার বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ দেশে। শোনা যায় এটা নাকি দার্শনিক ও মিষ্টিক Schwendenborg এর উক্তি। কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু একে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা মুস্কিল। কারণ মানুষ যখন উত্তেজিত হয় তখন উত্তেজনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্ভুল চিন্তার নীতি প্রয়োগ করতে প্রায়ই পারে না। এদিক্ দিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সকলেই সমপর্যায় ভুক্ত।

মাত্র বছর তিরিশ আগেও উন্নত আধুনিকেরা অযৌক্তিক চিন্তা ও কাজের জন্য প্রাচীনদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্তো। প্রাচীনেরা নিজেদের দেবতাদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলে মনে করতো, অথচ কারু ও চারুশিল্পে, এবং সাহিত্যে তাদেরই মত উন্নত অপর জাতিদের বর্বর আখ্যা দেবার মত মূর্খামি করতো। আধুনিকদের নিকট এ অত্যন্ত যুক্তিহীন ও অন্যায় মনে হয়।

গত তিরিশ বছরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে এবিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিকে কোনো প্রভেদই নেই। গত মহাযুদ্ধে দুই পক্ষই মনে কোরতো তারাই একমাত্র ন্যায় ও সত্যের অধিকারী এবং দুই পক্ষই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতো ন্যায় ও সত্যকে সাহায্য করবার জন্য। দু'পক্ষের রাজনীতিক ও ধর্মযাজকেরাই শুধু নয় এমন কি বৈজ্ঞানিকেরাও নিজ নিজ বিশেষ মার্কা ন্যায়-পরায়ণতার স্বপক্ষে এমন সব অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করতো যে, দুই পক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবীর মধ্যে পড়ে হাইকোর্টের জজ্দের যে অবস্থা হয়—ভগবানেরও সেরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায় নিশ্চয় পড়্তে হোয়েছিল। যুদ্ধের পর ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেনশ যখন পিরামিড্ দেখতে গিয়ে নিজেদের মৃতদেহের উপর কৃত্রিম স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করবার মূর্খামির জন্য মিশরীয় ফেরয়াদের সম্পর্কে উদ্ধত মন্তব্য করেন তখন মিশরীয় খবরের কাগজগুলো তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, হয়ত দু'শ বছর পরে ভার্সাইর সন্ধিপত্র, যার জন্ম দাতাদের মধ্যে ক্লেমেনশ একজন—পিরামিডের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নির্বুদ্ধিতার স্মৃতিস্তম্ভ বলে বিবেচিত হবে।

জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ প্রভৃতি বিচিত্র মতবাদ অতীতের দেবতাদের স্থান অধিকার করেছে; এবং এই সব বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মত-বাদ নিয়ে অতীতের বর্বর জাতিদের যুদ্ধের মতই হিংস্র ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলেছে। এই বিভ্রান্তকারী 'ইজম্' এর বন্যার মধ্যে কোনটি নির্ভুল কে বলবে। সংঘর্ষগুলিকে সম্পূর্ণ ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভুলের সংঘর্ষ বলা কঠিন—বরং সত্য সম্পর্কে দুই বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সংঘর্ষ বলাই ঠিক্, হেগেলের একথার নৈরাশ্য থেকে জন্ম। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিতে বিচারশীল চিন্তার সংজ্ঞা দেওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব কাজ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেসব বিষয় মানুষের উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না সে সব ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। কিন্তু মধ্যযুগের অবস্থা সেরূপ ছিল না। তখন ধর্ম ও সংস্কারের শিক্ষাতে মানুষের মন এমন অভিভূত ছিল যে—জ্ঞানের ক্ষেত্রেও নির্ভুল চিন্তা করবার অভ্যাস মানুষ

হারিয়ে বসে ছিল, ফলে পূর্বপুরুষদের চেষ্টাদ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে নির্ভুল মনে করা ছিল রীতি—প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু মতামত প্রকাশ করলে, তাকে এ জগতে সমাজের অত্যাচার ও পরজগতে নরকাগ্নির ভয় সহ্য কোরতে হোতো।

১৫ শতকে পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিচারহীন চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করবার মনোভাব প্রচলিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীক্ প্রভাবের পুনরাবৃত্তি থেকেই "বিচারশীল চিন্তার" জন্ম-কাল গণনা করা হয়। কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য যুক্তি-প্রবণতার যুগ আছে। কিন্তু নানা কারণে রেঁনাশাঁসকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়। এই রেঁনাশাঁসের প্রভাব ইউরোপে ৪০০ বৎসর কাজ করেছে। এতে বুদ্ধি ও কৌশলের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হোয়েছে যার ফলে সমস্ত জীবনযাত্রার প্রণালীতে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। প্রথম প্রথম রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেঁনাশাঁসের প্রভাব ছিল কম। কিন্তু ক্রমে এসব ক্ষেত্রেও প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে রেঁনাশাঁসের প্রভাবই জয়লাভ করে। রেঁনাশাঁসের প্রভাব কত বেশী হোয়েছিল একটি উদাহরণ তা থেকে বোঝা যাবে—ফরাসী বিপ্লবের কালে —ফরাসী জাতি তাদের পুরোণো ধর্মকে বর্জন কোরে তার পরিবর্তে বিচারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে। তারা বোঝেনি যে এ কাজটাই একটা যুক্তিবিরোধী কাজ।

কিন্তু রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম এসব ক্ষেত্রে বিচারশীল চিন্তার প্রসার কমই হোয়েছে, তার ফলে বর্তমান কালে সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডী—ইউরোপীয় জাতিগুলিদ্বারা অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান জাতিগুলির ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বিগত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ—দেখা দিয়েছে। মানব-সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে "বিচার প্রবণ চিন্তা"র প্রয়োগ করা কি একেবারে অসম্ভব? দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিহাসের একদর্শী শিক্ষার জন্য বর্তমান যুগের মানসিক অবস্থা এই সকল বিষয় প্রশস্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচার করবার পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু হয়ত কয়েক শত বৎসর পর কোনো দার্শনিক একালের সংঘর্ষগুলিকে প্রাচীন যুগের সংঘর্ষের মতই যুক্তিহীন মনে করবেন। বিশেষ সুবিধাভোগ করবার জন্য পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতিগুলি গত মহাযুদ্ধে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বর্তমান যুদ্ধকে বিভিন্ন দুই মতবাদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু চরম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে আরম্ভ কোরে, চরম মার্কসবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ পরীক্ষা কোরলে দেখা যাবে কোনটিই সম্পূর্ণ খারাপ নয়, কোনটিই সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নয়। বস্তুতঃ রাশিয়া যেমন চরম মার্কসবাদ থেকে সুরু কোরে দেখ্‌ছে যে ধনতান্ত্রিক দেশদ্বারা পরিবেষ্টিত হোয়ে পুরোণো ব্যবস্থার কিছু কিছু তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দুর্গগুলিও শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কে বিভিন্ন পরিমাণের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করবার প্রয়োজন বোধ করেছে।

ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যে যে সকল দেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাদেরও শাসন-কৌশল একই প্রকারের হোয়ে উঠ্‌ছে এবং কোনো ব্যবস্থার যে সব উপাদানকে অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হোতো কয়েক দশক পরে সেগুলির ও অভাব লক্ষিত হোচ্ছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর নাজিবাদ ও ফ্যাসীবাদ গড়ে উঠেছে। জগতের বড় বড় সাধারণতান্ত্রিক দেশগুলি দৃশ্যতঃ এই নীতিকে নিন্দা করে থাকে কিন্তু তাদের বাক্য ও কার্যের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের অধীনে ১৫০ লক্ষ "কালার্ড" জাতি বাস করে। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে এদের কয়েকটি মাত্র "জেনিটর" রয়েছে। প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকতর উদার বলে দাবী করা হয়—কিন্তু রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে সকলেই রোমীয় নাগরিক হবার অধিকার লাভ করতো—বৃটিশ সাম্রাজ্যে এরূপ আইন এখনো বহুদূরে। কাজেই জগতের তথাকথিত উন্নত জাতিগুলি যখন ডিমোক্রেসীর সুবিধা সম্বন্ধে বাক্‌বিস্তার করেন তখন সেগুলি নিজেদের দেশকে লক্ষ্য করেই করেন। এধরণের কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য জন-সংঘের পক্ষে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তকারী। ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছে যে যারা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা চালিত হয় কিছু আগে কি পরে এর ফল তারা ভোগ করে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের এই দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিচারশীল মননার অভাব; আর রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো কথাই নাই। বর্তমান ভারতবর্ষের নানা বিরুদ্ধ চিন্তাধারার সংঘর্ষকে যদি কেউ দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেন তবে তাঁর পক্ষে এখানকার নানা দল ও সম্প্রদায়কে এভাবে বর্ণনা করা অন্যায় হবে না, যে এই সব দল হলেন অগণিত মাছের ঝাঁকের মতন, জালে আটকা পড়ে প্রত্যেকেই বিপরীত দিকে জালকে টানছেন। অল্প কিছু দিনের জন্য একটা ঐক্যের মনোভাব এখানে দেখা গিয়েছিল, তার কারণ হলো একটা সার্বজনীন অন্যায় ও অবিচারের উপলব্ধি। কিন্তু যে মুহূর্তে এই অন্যায় ও অবিচারের কিছুটা দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, অমনি পুরোণো কুসংস্কার ও মানসিক সংকীর্ণতাগুলো আবার ফিরে এসে জাতীয় জীবনের ক্ষতিসাধন করতে শুরু করলো। বলা বাহুল্য এই সব সংস্কারের জন্ম হয় ইতিহাসের ভ্রমাত্মক শিক্ষা থেকে। নিরপেক্ষ ও যথার্থ অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি নিয়ে সমস্যাগুলোকে না দেখতে পারলে—এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

কেউ হয় তো তর্ক তুলবেন যে রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম; কারণ কংগ্রেসের 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির' আলোচনায় যোগ দিয়ে আমরা অন্য-রকমটী দেখেছি। ক্যাপিটালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট, শিল্পপতি ও শিক্ষাব্রতী, সব রকম মতবাদের লোকই

এই কমিটীর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, এমনকি হয়তো যতজন মেম্বার ছিলেন ততটী মতবাদও ছিলো কমিটীতে। বিশেষ বিশেষ বিষয় ও সমস্যার আলোচনার জন্য আলাদা আলাদা ২৯টী সাবকমিটী গঠিত হয়েছিল। এই সব সাবকমিটীর সভ্যদের মধ্যে সব রকমের বিভিন্ন ও বিরোধী মতই ছিলো। আর বিষয়গুলোও সব এমন ছিলো যা নিয়ে তুমুল তর্ক বাঁধবার খুবই সম্ভাবনা ছিল, যথা যন্ত্রশিল্প, কিষাণ-মজুর, ব্যাঙ্ক ও কারেন্সী, শিল্প-নীতি ইত্যাদি। তবু পরিকল্পনা কমিটী ও সাব-কমিটীগুলির সকল মেম্বারেরই এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, নিরপেক্ষ ভাবে সকল বিষয়ের সবগুলো সমস্যাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হলে, দেখা গেল সকলের মনেই একই ধরণের সমাধান উপস্থিত হয়েছে: আর খুব তর্ক-বহুল বিষয়েও প্রভূততম মতের ঐক্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা গুলোর সম্বন্ধেও বিচারশীল মননার নীতি প্রয়োগ অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু আজকালকার রাজনৈতিক নেতারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্যার বিবেচনা করবেন, এমন মানসিক গঠনই তাদের নেই। এ কাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে একেবারে নতুন ধরণের মনকে। অবশ্য রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা গুলির বৈজ্ঞানিক সমাধান পাওয়া গেলেও বিনা বিরোধে ও বিনা সংগ্রামে তাদের কাজে প্রয়োগ করা যাবে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

পলিবিয়াস্ (Polybius) নামে একজন গ্রীক ঐতিহাসিক কয়েক বছর বন্দী হয়ে রোমে ছিলেন এবং এই সূত্রে বড় বড় রোমানদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগলো; রাজনীতিতে গ্রীকরা কেন সফল হতে পারলো না, অথচ তাদেরই কাছে শিক্ষা পেলো যে রোমান জাত এবং যে জাত সামান্য মাত্রও মৌলিকতা দাবী করতে পারে না, তারাই বা কেন জগতে হলো সব রকমে সার্থক ও সফল? তাঁর মনে হলো, এর এক মাত্র কারণ এই হতে পারে যে রোমানদের শাসনপদ্ধতিতে রাজতান্ত্রিক (monarchical), সম্ভ্রান্ততান্ত্রিক (aristocratic) ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সুন্দর সামঞ্জস্য ও মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ গ্রীকরা তাদের শাসন-পদ্ধতি গঠন করেছে নিছক অবাস্তব বুদ্ধিশীলতার সাহায্যে, কিন্তু রোমান জাতি তাদের রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছে দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম ও সংঘর্ষে, সঞ্চিতঅভিজ্ঞতার সাহায্যে। তাদের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোন একজন লোকের নয়, বহুজনের সৃষ্টি; এর নিখুঁত পরিণতি ঘটেছে এক জীবনের চেষ্টায় নয়, বহু পুরুষের এবং অনেক যুগের সাধনার ফলে। বর্তমান বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে যুগোপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক সমাজ পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে যদি সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করা হয় নিরপেক্ষ ও বাস্তব বুদ্ধির সাহায্যে এবং যদি ইতিহাসের যথার্থ শিক্ষাকে স্মরণ রেখে তার অভিজ্ঞতাকে সমগ্র সমাজের কল্যাণে নিয়োগ করা হয়।

'Science and Culture' পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা হইতে—জঃ সঃ

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের তিনটি স্তম্ভ

পুলকেশ দে সরকার

ইতিহাস এবং খবরের কাগজ যাঁরা পড়ে থাকেন তাদের মাথায় ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নটা আসে আচ্ছা, ভারতের কি হবে?

প্রশ্নটায় অনেক গুলো কথা জড়িত আছে। নেহাৎ সংকীর্ণ মুহূর্ত ছাড়া স্রেফ ঢিলে প্রশ্ন করতেও, ভারতের অন্য প্রদেশের কথা জানিনে, বাঙালী প্রশ্ন কর্তা "ভারতের" কথাই ভাবেন। এ শিক্ষা বা সংস্কার তাঁর মোটেই নূতন নয়; ইংরেজ রাজত্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর মগজে এই ভারতের মানচিত্রও সেই অনুপাতে অংকিত হয়েছে; বাঙালী অনুপ্রেরণা পেয়েছে শিবাজী থেকে, পৃথ্বীরাজ থেকে আর রাজপুতনার ইতিহাস থেকে। তা'ছাড়া দেবদেবতার যত কাণ্ডমাণ্ড সবই পশ্চিমের অর্থাৎ অযোধ্যা থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। ব্যাপক ইতিহাস উপেক্ষা করলেও আধুনিক রাজনীতিতেও এ সংস্কার তার ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সমসাময়িক। এর নিদর্শন তার সাহিত্যে।

তারপর ভারতের কি হবে? এ প্রশ্নে একথাই নিহিত আছে যে, ভারতের কিছু হওয়া দরকার। অর্থাৎ, প্রশ্নকালে ভারতের পরাধীনতা তাঁর মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে; তাইতে দীর্ঘশ্বাসের বদলে এই নৈরাশ্য-কোটেড্-আশার কথাটা পেড়ে বসেন।

কেন পাড়েন?

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধে হারতে হারতেও রুশিয়া যখন মরণপণ প্রতিরোধ করতে থাকে তখনও প্রশ্ন জাগে; আবার ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও যখন জার্মাণেরা এগোতে থাকে তখনও এই একই প্রশ্ন জাগে। এই শৌর্যের উত্তেজনা প্রশ্নকর্তার রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মাণী একের পর অপর দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে—আশ্চর্য এই, তখনও এই বিস্ময়কর প্রশ্ন জাগে। রয়টার যখন বলে, জার্মাণ পদানত চেকোশ্লোভাকিয়ায় নির্মম পীড়ন নীতি চলছে, কিন্তু চেকদেশপ্রেমিকরা বধ্যভূমিকেই তীর্থভূমি করে তুলছে, তখন এই স্তিমিত স্তব্ধ নির্জীব ভারতের দিকে চোখ পড়েই, আর সেই অতলস্পর্শী প্রশ্ন জাগে। কোথাও হয়তো একটা অতি সাধারণ কু'দেতা হয় এবং—ধরুন না কেন, এই সেদিনকার কিউবা অথবা গতকালের পানামার কু'দেতা—তাতেই মনে এই চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন জাগে। লাভ ক্ষতির কোন বিবেচনাই যেন সেখানে নেই। চেম্বারলেন-চার্চিল যখন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা তোলেন তখনও একবার গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করি—আমরা? আমাদের? লজ্জার বালাই না রেখে তারা যখন বলেন, না—না—তোমরা কি? তখনও আমরা লজ্জার মাথা খেয়ে

ঐ প্রশ্নটাই জপ্‌তে থাকি। অপমানাহত হয়েও যখন শুনি রুজভেল্ট-চার্চিল কি একটা ঘোষণা করেছেন, তখন ফের এই প্রশ্ন তুলি।

পরাধীনতা রোগের এ যেন ডিলিরিয়াম। বল্‌তে লজ্জা নেই, চীনেরা যখন জাপানীদের অগ্রগতিকে বাধা দেয়, তখন আমরা খুসী হই বটে কিন্তু আরও খুসী হই যখন শুনি জাপানীরা ইংরেজের গালে চড় মেরেছে; ভাবি, কোথায় যেন জিতে গেলাম। যখন ইউরোপে যুদ্ধ লাগে তখন আত্মতুষ্টির একটা ভঙ্গী করে বলি—এইবার! নাৎসী জার্মাণী অপর দেশকে পদানত করছে শুনেও, যে ইংরেজ আমাদের পদানত করে ক্রমাগত আমেরির নির্বোধ বুলির ঝড়ে আমাদের উত্যক্ত করে তুলছে, তাকে কেউ আঘাত করছে জান্‌লে আমাদের মনে হাল্কা নির্বুদ্ধিতার ছোঁয়াচ না লেগেই পারে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে উলুখাগড়ার যে কি হবে তা সবিশেষ জানা সত্বেও এ অদ্ভুত প্রতি-ক্রিয়া আমাদের মনে কোথা থেকে একটা তৃপ্তি জাগিয়ে তোলে। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে তাতেই আমরা দর্শকের গ্যালারিতে বসে হাততালি দিচ্ছি। শুধু ঐ ডিলিরিয়ামের গাম্ভীর্যটা এলে চির পুরাতন প্রশ্নটা করি: আচ্ছা, ভারতে কি হবে?

চীন জিত্‌লেও আমরা স্বাধীন হব না—রুজভেল্ট-আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আমরা স্বাধীন হব না—ইংরেজ বা জার্মাণ জিত্‌লে তো হবই না। তবুও এই প্রশ্ন কেন?

এজন্য দায়ী পুঁথিবদ্ধ ইতিহাস ও দৈনন্দিন ইতিহাস বা সংবাদ পত্র।

ধরুন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (যার তারিফ আজ ইংরেজরাই করে এবং তৎকালীন যে বিদ্রোহীদের কাছে ইংরেজেরাই ভিক্ষাপ্রার্থী ও যাদের কলকোলাহলে স্তব করে); স্বল্পসংখ্যক প্রায়-নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসৈন্য—গাদাবন্দুকের যুদ্ধ। থার্মোপলি থেকে ফরাসী বিপ্লব, ম্যাট্‌সিনি থেকে লেনিন। রুশবিপ্লবের দীর্ঘ কুটিল ইতিহাস।

প্রশ্ন না জেগে উপায় কি?

কেবল এই জন্যই কি জাগে?

জাগে, বিদেশী নিপীড়িতদের আহত অভিমানের সঙ্ঘবদ্ধ গোপন যড়যন্ত্র ও আকস্মিক অগ্ন্যুদ্গারের সাফল্যে নিজেদের সাফল্য স্বপ্নরচনায়। মনে হয় এই তো পথ! যে শাসনের নাম নির্যাতন, যে বিদেশী নিষ্করুণ শোষণের নাম দুর্ভিক্ষ সেখানে তো বিষ্ফোরণের সৃষ্টি অনিবার্য। এই চাপা অসন্তোষই বিদ্রোহের বীজ।

তবে আর ভাবনা কি? যে শাসনে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জন্মায় সে শাসনই তো সিডিসান—বিদ্রোহাত্মক। ওদের ঐ ১২৪-ক ধারাটা তো মিস্‌নোমার যদি না ওটা ওদের ওপরেই প্রযুক্ত হয়।

আমাদের ঐ স্বপ্ন এই মতবাদের ওপরই রচিত হয়। আমরা টেবিল চাপ্‌ড়ে বলি, ভাবনা কিরে, কিসের ভয়, এই অসন্তোষ-বিদ্বেষই হবে আমাদের নেতা, নেবে মুক্তির তোরণদ্বারে।

ধরে'নি, এই অসন্তোষই যখন বিদ্রোহ-কাম্‌-মুক্তির প্রসূতি তখন যেহেতু ভারতে বিদেশী শাসন জনিত অসন্তোষ আছে সেই হেতু মুক্তির আলোক ও দেখা যাবে।

আর চাই স্বার্থত্যাগ। দুর্ভিক্ষের মধ্যেও ভোগের প্রশ্ন যেন কোন সূত্রে মগজে প্রশ্রয় না পায়। অতি কষ্টেও আমরা তা মেনে নিয়েছি। যেদেশে অহিংসা মন্ত্র ধর্মের মত লোকে গ্রহণ করে, পুলিশের মৃদু লাঠি চালনায় পিঠের হাড় ভাঙ্‌লে হিংসার টু শব্দটি পর্যন্ত করে না, পিনালকোড ও পুলিশকে সেলাম জানিয়ে সুশৃঙ্খল মিছিলে জেলে যায়, দেহকে নিরাবরণ ও কাপড়কে হাঁটু ছাড়িয়ে বহু উর্ধে তুলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করে না, নেতার নির্দেশে ঘাসের মধ্যে ভাইটামিন খোঁজে সেদেশে স্বার্থত্যাগের চরম ও চূড়ান্ত হয়েছে—তবুও ভারত যে তিমিরে সে তিমিরে। কেন?

অসন্তোষ আর স্বার্থত্যাগ দুই বলদকে জুড়ে দিয়েও গাড়ী চালান গেল না কেন?

এমনও নয় যে, এরা ভয়ে অহিংস হয়েছে। এরা নিরস্ত্র হয়ে মরতে জানে; এরা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসীতে যেতে পারে; এরা ভক্তির চোটে 'জয় জনবুল' বলে সৈন্যদলে যোগ দিতে পারে, আফ্রিকার মরু কান্তারে প্রাণ দিতে পারে (যত্রতত্র নির্ভয় নিঃসংকোচে গোয়েন্দাগিরিও করতে পারে), হিন্দু মুসলমান মারামারি একে অপরের লহুপানের জন্য উন্মত্তও হতে পারে। মরতে বা সইতে এরা ভয় পায় না।

এরা নিয়ম-শৃঙ্খল মানে না এ তুর্ণামও কেউ দেবে না। একলক্ষ অহিংস সৈন্যের কেউ হিংসা তো হয়ই নি; এত বড় যে আইন অমান্যের আন্দোলন তাতেও কোথাও এতটুকু আইন অমান্য করেনি; নেতার নির্দেশে বিবেকদষ্ট হত্যাকারীর মত পুলিশের কাছে স্বীয় অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জেলে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মাথা কুটেছে। জেলারকে কোনদিন এই সুবোধ "অপরাধীদের" নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি।

গান্ধীজী এই নূতন শাস্ত্র শিখিয়েছেন। বাস্তবিক অভক্তির নামে কত ভক্তি (মানে রাজ ভক্তি) গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন তা অবশ্য আমরা আজও উপলব্ধি করিনি, কিন্তু আমেরির মত দু'একজন নির্বোধ (বোধহীন) রাজকর্মচারী ছাড়া বৃটীশ কূটনীতিকদের বুঝ্‌তে বেশী দেরী হয়নি। তাঁরা জানেন, ভারতে বৃটীশ অস্তিত্বের মস্ত বড় স্তম্ভ হচ্ছেন গান্ধীজী এবং গান্ধীবাদ। এই গান্ধীবাদ নইলে অসন্তোষটা হয়তো ভারতের জীবনে সত্য উঠ্‌তে হ'য়ে পারত। গান্ধীজীর সূক্ষ্ম অবোধ্য সেফ্‌টি ভাল্‌ভের ভেতর দিয়ে তা মিথ্যে হ'য়ে গেছে। সেকথা গান্ধীজীও জানেন, বৃটীশ কূটনীতিকেরাও জানেন।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের তিনস্তম্ভের তিনি অন্যতম। আর দু'জন হচ্ছেন মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্না এবং হিন্দুমহাসভাপতি বীর সাভারকর। এই ত্রয়ীর লক্ষ্য বস্তুনিরপেক্ষভাবে এক, সামান্য কিছু দৃশ্যতঃ পথের গড়মিল আছে। কিন্তু সে গড়মিল সম্পূর্ণ দৃশ্যতঃ এর বেশী নয়।

গান্ধীজীর সবচাইতে বড় চাল বাজি হচ্ছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বিশেষণগুলো দ্রষ্টব্য। রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ সে বড় সহজ কথা নয় এবং ঠিক এই বৃহত্তের মোহেই হয়তো যাদের সত্যি সত্যিই কিছু বিপ্লবী মনোভাব ছিল তারাও ঝুঁকে পড়ল। ধরে নেওয়া হল, শতকরা এক'শ জন ভারতীয় যদি (অহিংস) অসহযোগ করে তবে একদিকে ইংরেজ রাজত্ব তাসের ঘরের মত পড়ে যাবে আর একদিকে সংজ্ঞাহীন স্বরাজের মোয়াটি (ভারতীয়দের) হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ব্যস তাতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু সাবধান, পিনাল কোডে যেমনটি লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলো। পুলিশ ধরলে বিবাদ করো না, জেল দিলে আপত্তি করো না, মারলে চুপটি করে থেকো। এই বলে গান্ধীজী আন্দোলনের ঘুড়িটি দিলেন উড়িয়ে নাটাইটি রাখলেন হাতে। ভারতের অসন্তুষ্ট গণেশ শিক্ষিতদের দেউলে দেউলে চরকার সুতোয় বাধা পড়লেন। সুতোয় কোথায় একটু কড়া পাক পড়তেই গান্ধীজী নাটাই গুটোলেন। ততদিনে সমস্ত মস্থিত শক্তি গান্ধীজীর সূক্ষ্ম মাকড়সার জালে ধরা পড়েছে। শাসকশক্তির কঠিন কাজ নিজেই সমাধা করলেন। ধূমায়িত বহ্নি জ্বলে উঠে ছাই হ'য়ে গেল।

কিন্তু অসন্তোষের কারণ যায়নি। তাই দলিতা ফনিনী আবার যুগান্তে যখন উঠতে চাইল, গান্ধীজী আস্থা অর্জনের জন্য আগেকার অপকীর্তিকে হিমালয় প্রমাণ ভুল বলে আরও মহিমাময় করে তুললেন। আবার বিপ্লবীশক্তি সংহত হ'ল। বলেছি গান্ধীজীর আন্দোলনের মূলসূত্র পিনাল কোডের প্রতি একনিষ্ঠ-ভক্তি। বিদ্বেষ-অসন্তোষ ছড়ানো চলবেনা, তা'হলে অহিংস হওয়া দায়। হ'ল ১২৪ ক ধারার ব্যবস্থা। সত্যাগ্রহী ধরা দেবে, সাজা নেবে। পালাবে না; মার খাবে, মারবে না। রাজকর্মচারীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানাবে। সংক্ষেপে: পুলিশ এবং আইনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা রেখে অহিংসভাবে যা হয় কর।

কথাটা বড়লাট ও বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললে অসন্তুষ্ট শ্রেণীটা সন্দেহের চোখে দেখবেই এবং সংজ্ঞাহীন স্বরাজের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিচারের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেবে না। সেকাজ গান্ধীজীর।

গান্ধীজীর সঙ্গে সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর তফাৎ এই যে শেষোক্ত স্পষ্ট এবং ভক্তির নামেই ভক্তি প্রকাশ করেন এবং পূর্বোক্ত অস্পষ্ট এবং অভক্তির নামে ভক্তি চালান ও তাতে ক'রে অভক্তদের সমাবেশে তাদের সর্বনাশ ক'রে ছাড়েন। জনগণ যাতে না জাগে সে জন্য গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষ থেকে সতর্ক পাহারা দেন; জনগণ যাতে বিচ্ছিন্ন হয় সেজন্য তিনি নির্দোষ আত্মকেন্দ্রিক চরকা হাতে তুলে দেন। ইংরেজ যখন আক্রান্ত হয়, অন্যত্র যখন বিব্রত থাকেন, তখন গান্ধীজী স্বয়ং অসন্তুষ্ট ভারতকে চেপে রাখেন, "শান্তি"র সময় অ-বিব্রত ইংরেজের দরবারে অসন্তুষ্টদের নিয়ে মিছিল করেন এবং সত্যাগ্রহীরা চিহ্নিত হ'য়ে যায়। পিনাল কোডের রক্তচন্দন তো পড়ছেই।

অহিংস গান্ধীজী এদিকে হাত গুটিয়ে নিলেও সহিংস যুদ্ধরত সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে অকুণ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। গান্ধীজীর শত্রু কেউ নেই, অতএব গান্ধী ভারতেরও নেই; তা নইলে হয়তো বা রুশ-জার্মাণেরা পরস্পরের শত্রু হিসেবে যে আচরণ করছে, ভারত হিংস না হ'য়েও সেই শত্রুতাচরণ করতে পারত। কিন্তু গান্ধীজী তার পক্ষপাতী নন—অতএব গান্ধী ভারত ও নয়। সেই গান্ধী ভারত বা কংগ্রেস আজ ইচ্ছা-সুপ্ত।

গান্ধীজী এভাবে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে আত্মস্থ ক'রে মোহগ্রস্ত ভারতের নাকের ডগা দিয়ে তাকে ভক্তির খাতে বইয়ে দিয়েছেন। আজ তিনি সার্থক। ইংরেজ রাজত্বের জয় হোক্।

কংগ্রেস খেলাফত সহযোগিতার দিনে যে ঐক্য ও সুপ্তশক্তি বিদেশী শাসনকে চিন্তাকুল ক'রে তুলেছিল সেই বেদনাকে মুক্তি দিলেন মিঃ জিন্না; কংগ্রেসের মধ্যে কীলকের মত ঢুকে বেরিয়ে যখন এলেন তখন ভারতের জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। বৃটীশ কূটনীতিকেরা একস্তম্ভ নিরাপদ মনে না করে এই স্তম্ভের পেছনে শক্তিব্যয় করলেন। অকস্মাৎ ভারতীয় মুসলমানেরা জানতে পারল, তারা বিদেশী এবং অপর ভারতীয় অ-মুসলমানের সঙ্গে তারা সমস্বার্থ সম্পন্ন নয়। অথচ জনশক্তির উত্তাল চাঞ্চল্যকে একহাতে ধ'রে রাখার দায় থেকে গান্ধীজী রেহাই পেলেন—জনশক্তি হিন্দু ও মুসলমান নামক দুই দ্বন্দমান শিবিরে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্মের পর্যায়ে ফেললেন, মিঃ জিন্না সেই ধর্মকে সম্প্রদায়ের পর্যায়ে আনলেন। রাজনীতি সাম্প্রদায়িক নীতিতে পর্যবসিত হ'ল। ঠিক এইখানেই বীর সাভারকর দেখা দিলেন। গান্ধীজী অহিংস না হ'লে কাউকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন না; সাভারকর জিন্নাজীর হুবহু পাল্টা জবাব দেন।

আবার একটা ভেদ দেখা দিল। যাঁরা জাতীয়তাবাদী এবং অহিংস সত্যাগ্রহী তাঁরা গান্ধী শিবিরে গেলেন কিন্তু যারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় ক'রে দেখেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত হ'লেন।

এঁরা কেউই গণ-আন্দোলনের পক্ষপাতী নন; উপরন্তু গণ-আন্দোলন ভয় পান। গান্ধীজী বলেন, "I dread mass movement." এরূপ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে; গণ-আন্দোলনকে ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্যই তিনি দু'বার জনগণকে আহ্বান করেছেন। জিন্নাজীর কখনও গণ-আহ্বানের প্রয়োজন ঘটেনি—ধর্মের নামে প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া। রাজনীতিতে তিনি গণ-আন্দোলন করতে চান না; তাদের সকল উৎসাহ ধর্মের খাতেই বইয়ে দেন—মানে সম্প্রদায়ের খাতে। বীর সাভারকর মহাসভার সভাপতিরূপে যে কর্মসূচী দেন তা স্বস্তিকা মার্কা। পরম কৌতুকের বিষয় এই, এঁরা জনগণের নামে কথা বলেন, তার কারণ আপন আপন সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষমতার অনুপাতে এঁরা জনগণকে ঠুঁটো ক'রে রেখেছেন। জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠ এঁরা তিনজনে সজোরে টিপে ধ'রে আছেন।

গান্ধীজী যুদ্ধে যোগদান ক'রতে চান না—কিন্তু যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের বাধা দিতে চান না। ক্ষীণ আপত্তি কেবল সেইখানে যেখানে জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় হয় এবং সেই আপত্তির আবেদন তাদের দরবারেই পৌছায় যারা এই আপত্তির কারণ। সহিংস যুদ্ধে সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে গান্ধীজী কোন আপত্তি দেখতে পান না। যুদ্ধ বিরোধী আপত্তি সাধারণে ক'রবে না,

ক'রবে বাছাইকরা সৈন্যেরা—সাধারণের ওপর যদি জুলুম না হয় তবে তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে সাহায্য বা যোগ দেবে। পুলিশ বা শাসন কর্তৃপক্ষ বিব্রত না হয় এজন্য গান্ধীজীর উৎকণ্ঠার অবধি নেই।

জিন্নাজী সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। লীগের গণ্ডীতে থেকে লীগের নির্দেশে লীগের পরিকল্পনায় যে পাকা ব্যবস্থা তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই কেবল সহযোগিতা হবে; তবে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী সহযোগিতায় কোন বাধা নেই।

সাভারকর পরিত্রাহি হিন্দুকে যুদ্ধে যোগ দিতে বল্‌ছেন।

অর্থাৎ যে জাতীয় গণ-আন্দোলনকে আইনের অছিলায় ইংরেজদের দমন কর্‌তে হ'ত ভারতীয় আন্দোলনের এই ত্রিস্তম্ভ নানা অছিলায় সেই কাজটিই নির্বিচারে ও নির্বিকারে ক'রে যাচ্ছেন।

ভারতের এই "বিবিলিপি" সম্পর্কে আশা করি, প্রশ্নকর্তার এর পর আর কোন বক্তব্য থাক্‌বে না।

দশ বছর অন্তর চার্চিল *

"ভারতবর্ষ আমাদের সকল ব্যাপারে এবং আলোচনায় শুধু অংশীদার নয়, শক্তিশালী অংশীদার হিসাবে ক্রমেই স্থান কোরে নিচ্ছে। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধে ভারতের দান যে কত বেশী তা আমরা জানি।" * * *

"আমরা ভারতের কাছে গভীর ঋণে আবদ্ধ এবং আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে সেদিনের অপেক্ষা কর্‌ছিলাম যখন ভারত সরকার ও ভারতের জনগন সম্পূর্ণভাবে তাদের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পাবে।"

চার্চিল—১৯২১

দশবছর পর—বলেন তিনি উপরোক্তক্ষেত্রে ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ শব্দটা কেবলমাত্র ব্যবহারিক অর্থে বলেছিলেন এবং জয়েণ্ট-সিলেক্ট কমিটিকেও বলেন যে তিনি কেবলমাত্র একটা উৎসব উপলক্ষ্যে 'শুন্‌তে ভাল এরূপ একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন রাজনীতিকদের যা অনেক সময়েই কর্‌তে হয়।'

চার্চিল—১৯৩১

"ভারতের প্রতি আটলান্টিক চুক্তিপত্র প্রযোজ্য নয়"

চার্চিল—সেপ্টেম্বর ১৯৪১

"কেবিনেটের কোনো সভ্য, মানুষের গননার মধ্যে আনা যায় এরূপ কোনো সময়ের মধ্যে ভারতের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলা দূরে থাক্ ইঙ্গিত করার কথা ভাবতেও পারেন না। *

—যথার্থ চার্চিল

* ৮ই অক্টোবরের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইতে গৃহীত।

অহিংস গান্ধীজী এদিকে হাত গুটিয়ে নিলেও সহিংস যুদ্ধরত সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে অকুণ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। গান্ধীজীর শত্রু কেউ নেই, অতএব গান্ধী ভারতেরও নেই; তা নইলে হয়তো বা রুশ-জার্মাণেরা পরস্পরের শত্রু হিসেবে যে আচরণ কর্‌ছে, ভারত হিংস না হ'য়েও সেই শত্রুতাচরণ কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু গান্ধীজী তার পক্ষপাতী নন—অতএব গান্ধী ভারত ও নয়। সেই গান্ধী ভারত বা কংগ্রেস আজ ইচ্ছা-সুপ্ত।

গান্ধীজী এভাবে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে আত্মস্থ ক'রে মোহগ্রস্ত ভারতের নাকের ডগা দিয়ে তাকে ভক্তির খাতে বইয়ে দিয়েছেন। আজ তিনি সার্থক। ইংরেজ রাজত্বের জয় হোক্।

কংগ্রেস খেলাফত সহযোগিতার দিনে যে ঐক্য ও সুপ্তশক্তি বিদেশী শাসনকে চিন্তাকুল ক'রে তুলেছিল সেই বেদনাকে মুক্তি দিলেন মিঃ জিন্না; কংগ্রেসের মধ্যে কীলকের মত ঢুকে বেরিয়ে যখন এলেন তখন ভারতের জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। বৃটীশ কূটনীতিকেরা একস্তম্ভ নিরাপদ মনে না করে এই স্তম্ভের পেছনে শক্তিব্যয় কর্‌লেন। অকস্মাৎ ভারতীয় মুসলমানেরা জান্‌তে পারল, তারা বিদেশী এবং অপর ভারতীয় অ-মুসলমানের সঙ্গে তারা সমস্বার্থ সম্পন্ন নয়। অখণ্ড জনশক্তির উত্তাল চাঞ্চল্যকে একহাতে ধ'রে রাখার দায় থেকে গান্ধীজী রেহাই পেলেন—জনশক্তি হিন্দু ও মুসলমান নামক দুই দ্বন্দমান শিবিরে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল।

গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্মের পর্যায়ে ফেল্‌লেন, মিঃ জিন্না সেই ধর্মকে সম্প্রদায়ের পর্যায়ে আনলেন। রাজনীতি সাম্প্রদায়িক নীতিতে পর্যবসিত হ'ল। ঠিক এইখানেই বীর সাভারকর দেখা দিলেন। গান্ধীজী অহিংস না হ'লে কাউকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন না; সাভারকর জিন্নাজীর হুবহু পাল্টা জবাব দেন।

আবার একটা ভেদ দেখা দিল। যাঁরা জাতীয়তাবাদী এবং অহিংস সত্যাগ্রহী তাঁরা গান্ধী শিবিরে গেলেন কিন্তু যারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় ক'রে দেখেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত হ'লেন।

এঁরা কেউই গণ-আন্দোলনের পক্ষপাতী নন; উপরন্তু গণ-আন্দোলন ভয় পান। গান্ধীজী বলেন, "I dread mass movement." এরূপ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে; গণ-আন্দোলনকে ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্যই তিনি দু'বার জনগণকে আহ্বান করেছেন। জিন্নাজীর কখনও গণ-আহ্বানের প্রয়োজন ঘটেনি—ধর্মের নামে প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া। রাজনীতিতে তিনি গণ-আন্দোলন করতে চান না; তাদের সকল উৎসাহ ধর্মের খাতেই বইয়ে দেন—মানে সম্প্রদায়ের খাতে। বীর সাভারকর মহাসভার সভাপতিরূপে যে কর্মসূচী দেন তা স্বস্তিকা মার্কা। পরম কৌতুকের বিষয় এই, এঁরা জনগণের নামে কথা বলেন, তার কারণ আপন আপন সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষমতার অনুপাতে এঁরা জনগণকে ঠুঁটো ক'রে রেখেছেন। জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠ এঁরা তিনজনে সজোরে টিপে ধ'রে আছেন।

গান্ধীজী যুদ্ধে যোগদান ক'রতে চান না—কিন্তু যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের বাধা দিতে চান না। ক্ষীণ আপত্তি কেবল সেইখানে যেখানে জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় হয় এবং সেই আপত্তির আবেদন তাদের দরবারেই পৌছায় যারা এই আপত্তির কারণ। সহিংস যুদ্ধে সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে গান্ধীজী কোন আপত্তি দেখ্‌তে পান না। যুদ্ধ বিরোধী আপত্তি সাধারণে ক'রবে না,

ক'রবে বাছাইকরা সৈন্যেরা—সাধারণের ওপর যদি জুলুম না হয় তবে তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে সাহায্য বা যোগ দেবে। পুলিশ বা শাসন কর্তৃপক্ষ বিব্রত না হয় এজন্য গান্ধীজীর উৎকণ্ঠার অবধি নেই।

জিন্নাজী সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। লীগের গণ্ডীতে থেকে লীগের নির্দেশে লীগের পরিকল্পনায় যে পাকা ব্যবস্থা তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই কেবল সহযোগিতা হবে; তবে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী সহযোগিতায় কোন বাধা নেই।

সাভারকর পরিত্রাহি হিন্দুকে যুদ্ধে যোগ দিতে বলছেন।

অর্থাৎ যে জাতীয় গণ-আন্দোলনকে আইনের অছিলায় ইংরেজদের দমন করতে হ'ত ভারতীয় আন্দোলনের এই ত্রিস্তম্ভ নানা অছিলায় সেই কাজটিই নির্বিচারে ও নির্বিকারে ক'রে যাচ্ছেন।

ভারতের এই "বিধিলিপি" সম্পর্কে আশা করি, প্রশ্নকর্তার এর পর আর কোন বক্তব্য থাকবে না।

দশ বছর অন্তর চার্চিল *

"ভারতবর্ষ আমাদের সকল ব্যাপারে এবং আলোচনায় শুধু অংশীদার নয়, শক্তিশালী অংশীদার হিসাবে ক্রমেই স্থান কোরে নিচ্ছে। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধে ভারতের দান যে কত বেশী তা আমরা জানি।" * * *

"আমরা ভারতের কাছে গভীর ঋণে আবদ্ধ এবং আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে সেদিনের অপেক্ষা করছিলাম যখন ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ সম্পূর্ণভাবে তাদের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পাবে।"

চার্চিল—১৯২১

দশবছর পর—বলেন তিনি উপরোক্তক্ষেত্রে ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ শব্দটী কেবলমাত্র ব্যবহারিক অর্থে বলেছিলেন এবং জয়েণ্ট-সিলেক্ট কমিটিকেও বলেন যে তিনি কেবলমাত্র একটী উৎসব উপলক্ষ্যে 'শুনতে ভাল এরূপ একটী বক্তৃতা দিয়েছিলেন রাজনীতিকদের যা অনেক সময়েই করতে হয়।'

চার্চিল—১৯৩১

"ভারতের প্রতি আটলান্টিক চুক্তিপত্র প্রযোজ্য নয়"

চার্চিল—সেপ্টেম্বর ১৯৪১

"কেবিনেটের কোনো সভ্য, মানুষের গননার মধ্যে আনা যায় এরূপ কোনো সময়ের মধ্যে ভারতের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলা দূরে থাক্ ইঙ্গিত করার কথা ভাবতেও পারেন না। *

—যথার্থ চার্চিল

* ৮ই অক্টোবরের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইতে গৃহীত।

বাস্তার রাজ্যে দশহরা

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রায়ই শুনিতে পাই, অনুন্নত সমাজ উন্নত সমাজের সহিত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। সভ্য সমাজ অসভ্য সমাজের সুবিধা অসুবিধা নিজেদের স্বার্থের দিক দিয়েই চিরকাল বিচার করে এসেছে, তাই, অসভ্য বা অর্ধসভ্য সমাজ সভ্যতার আলোক হতে বঞ্চিত রয়েছে—বা সভ্য সমাজের সুবিধায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সমাজ একে অন্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করতে পারে না, পারবেও না, তাই হিন্দু তার সভ্যতা ও কৃষ্টি বজায় রাখতে, হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবে। মুসলমান পাকিস্থানে তার বৈশিষ্ট দৃঢ় করবে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের আজ কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই প্রয়োজন যে তা নয়, সামাজিক বৈশিষ্ট ও তেমনি প্রয়োজনীয়, তাই দেখতে পাই গ্রামে গ্রামে আজ নমঃশূদ্র বা তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভদ্রলোকদের সহিত একরকম অসহযোগ আরম্ভ করেছে, যার ফলে, তপশীলভুক্ত 'জাতির' পত্তন হয়েছে। শ্রেণী বিভাগ ও সমাজভেদের জন্য ভারতবর্ষ বহু অসুবিধা ভোগ করেছে, আজ 'জাতি' ভেদের জন্য, আরও কত লাঞ্ছনা পাবে, তার কল্পনাও ভয়াবহ। কিন্তু, এই জাতি ভেদের ভিত্তি এত কায়েমী করে গড়ার কি কোনও প্রয়োজন রয়েছে? এর উত্তর বাস্তার রাজ্যের দশহরার বিবরণ হতে পাওয়া যাবে। কী করে একটী হিন্দু উন্নত সম্প্রদায়, অসভ্য, বন্য জাতিদের নিজেদের কৃষ্টির আবেষ্টনীতে দৃঢ় করে বেঁধেছে, কেমন করে অসভ্য সমাজ সভ্য সমাজের গণ্ডীর ভিতর এসে, সভ্য সমাজের রীতিনীতি ধর্ম-কর্ম নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে, সভ্য সমাজই কী করে অসভ্য আচার ব্যবহার নিজেদের কৃষ্টির অঙ্গীভূত করেছে—তা এই দশহরা উৎসব হতে প্রমাণিত হবে।

মধ্যপ্রদেশে বাস্তার সব চেয়ে বড় করদ রাজ্য। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ক্যাপ্টেন হেকটব মেকেঞ্জির রিপোর্ট হতে দেখা যায়, পূর্বে 'বাস্তার রাজ্য' আরও বিস্তৃত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে ২৩৫ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮২ মাইল। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার হিসাব মতে এর বিস্তৃতি ১৩,৭২৫ বর্গ মাইল মাত্র। বাস্তারের উত্তরে কাঁকড় রাজ্য ও রায়পুর জেলা, পূর্বে ভিজগাপত্তম জেলার জয়পুর জমিদারী, পশ্চিমে চান্দা জেলা ও হাইদ্রাবাদ রাজ্য এবং খরস্রোতা গোদাবরী নদী দক্ষিণ প্রান্তদেশ বেষ্টন করে চলেছে। রাজ্যের বেশীর ভাগই বিস্তৃত বনভূমিতে পরিপূর্ণ। রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্বতাকীর্ণ, মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উচ্চ নীচ পাহাড় এবং নীচে মালভূমি। পূর্বভাগে সুন্দর সবুজ মাঠ, মালভূমির দক্ষিণে ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে বাস্তারের রাজধানী জগদলপুর।

বাস্তারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আবুজমার পর্বতশ্রেণী চলেছে, এই পর্বতে বাস্তারের সব চাইতে অসভ্য, আদিম অধিবাসী 'মার'দের বসতি। 'মার' বা 'মারিয়া'রা তথাকথিত গন্দ জাতির বংশধর, এখনও 'গন্দাল' ভাষায় কথা বলে, এবং গন্দদের প্রায় সব রকম আচার ব্যবহারই তারা মেনে চল। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, গন্দরা মেডিটেরেনিয়ান (Mediterranean) জাতির বংশধর, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল ও অন্যান্য অষ্ট্রালিয়ড (Australoid) জাতির সহিত মিশে এক নূতন 'বংশ-জাতির' পত্তন করেছে। গন্দ জাতির অন্যান্য শাখা, যথা মুরিয়া, ডাণ্ডামি মারিয়া, ধ্রুব, ভাতরা, ঝোরিয়া-মুরিয়া এবং আরও ছোটখাট অনেক উপজাতি, অতি প্রাচীনকাল হতেই বাস্তারে বসতি করছে। উহাদের জীবন যাপনের বিধি-নিয়ম—এখনও হিন্দুদের মত হয় নাই সত্য—কিন্তু ক্রমে ক্রমেই উহারা হিন্দুর যাগ-যজ্ঞ, হিন্দুর প্রথা, আচার-ব্যবহার, হিন্দুর পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি গ্রহণ করছে ফলে ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে গন্দদের যে বৈশিষ্ট এখনও আছে তাও লোপ পাবে বলে মনে হয়।

বাস্তারের রাজবংশ রাজ কুলোদ্ভব। কিম্বদন্তি আছে, যে রাজা অনম দেও, যিনি বর্তমান বাস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম ওআরাঙ্গালে (Warangli) ছিলেন। রাজা অনম দেও ধর্মপরায়ণ এবং পূজা পার্বনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান নরপতি জানতে পারলেন, যে অনমদেওর নিকট একটি পরশ পাথর আছে যা, যে কোনও ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। ঐ পরশ পাথরের জন্য রাজা অনমদেওর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা অনম দেও যখন কি করা কর্তব্য ঠিক করতে পারছিলেন না, তখন দেবী 'ধান্তেশ্বরী',—রাজার কুল দেবী, স্বপ্নে রাজার নিকট প্রস্তাব করেন যে অনম দেও যেন শীঘ্র ওয়ারাঙ্গাল পরিত্যাগ করেন। রাজা স্বপ্নে দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করাতে দেবী সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতা হন এবং জানান, যে রাজা যখন রাজত্ব পরিত্যাগ করে যাবেন, তিনি পেছনে পেছনে যাবেন এবং তাঁর পায়ের নুপুরের শব্দ যেখানে থামবে রাজা যেন সেখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু, রাজা বা তার অনুচরেরা পেছনে তাকাবেন না যদি তাকান তবে নুপুরের শব্দ থামবে এবং রাজার গতিরোধ হবে। রাজার সহিত, রাজগুরু, কতিপয় সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় পরিবার ও রাজার একদল শরীররক্ষী হালবা (Halba) সেনাদল ভিন্ন আর কেহ আসে নাই। ধান্তেশ্বরী দেবীর তলোয়ারখানা রাজা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রাস্তা চলতে চলতে রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা পাইরি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতে জল খুবই অল্প ছিল, রাজা নদী পার হচ্ছেন এমন সময় নুপুরের শব্দ অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর লাগল, রাজা দেবীর আদেশ ভুলে, শব্দ অনুসরণ করে পেছনে তাকালেন। নুপুরের শব্দ বন্ধ হল রাজা অত্যন্ত অনুতাপের সহিত, পাইরি নদীর অপর তীরে রাজ্য স্থাপন করলেন। এই পাইরি নদী আজ কাঁকড় ও বাস্তার দুই রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করে। এখনও ধান্তেশ্বরীর মন্দিরে বাস্তার রাজের আদেশে দেবীর তলোয়ার নিত্য মন্দিরে পূজা হয়।

পূর্বেই বলেছি বাস্তার গন্দদের দেশ এবং মারিয়ারাই সব চেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। যারা এখনও আবুজমারে বাস করে তারা বাস্তবিকই অসভ্য জীবন যাপন করে, কিন্তু যারা সমতল ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করছে, তারা কৃষি কাজ করে এবং অনেক বিষয়েই তারা অন্যান্য কৃষিজীবিদের মত জীবন আরম্ভ করেছে। কেবল আবুজমারের মারিয়া ভিন্ন আর সবাই নিজেদের দেব-দেবীর সহিত, হিন্দুর দেব দেবীর পূজা ও হিন্দু তিথি ও উৎসব নিজেদের বলে মনে করে, এবং প্রত্যেক গন্দ গোত্রজাতিই আজ বাস্তারের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দশহরাতে যোগ দেয়। এই উৎসব দীর্ঘ এক পক্ষকাল ধরে চলে এবং সমগ্র বাস্তারবাসী এই উৎসবের জন্য পথ চেয়ে থাকে।

প্রতি বৎসর কার্তিকেয় অমাবস্যায় অপরাহ্নে জগদলপুরবাসী ও নিকটবর্তী স্থান হতে আগত প্রজাপুঞ্জ রাজপ্রাসাদের দ্বারে সমবেত হয়। তন্মধ্যে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ও থাকে। মাহারারা বাস্তারের অস্পৃশ্য সম্প্রদায় কিন্তু বাস্তারের অধিবাসীরা মাহারাদের তাঁতে তৈরী কাপড় পরিধান করে। এখনও বাস্তারে মিলের কাপড়ের কাটতি খুব বেশী নাই—সাধারণ লোকে এখনও মোটা তাঁতের কাপড় পরে, দূর গ্রামে এবং পাহাড়তলীতে পরিধান বস্ত্রের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত নয়, তাই এখনও কেহ কেহ উলঙ্গ জীবন যাপন করে। দশহরা উৎসবে ধান্তেশ্বরীরই পূজা হয় কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও এই উৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে। কেবল হিন্দুদের দেবদেবীর পূজাই যে হয় তা না, বহু গন্দ দেবদেবীও ভক্তিভাবে উপাসিত হয়। তাই আজ বাস্তারে দশহরা উৎসব এক বিচিত্র ব্যাপার হয়ে উঠেছে—এমন কোনও শ্রেণী বা উপজাতি নেই যারা এই উৎসবের কোনও না কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে সাহায্য না করে এবং এই সাহায্য ব্যতীত দশহরা উৎসব যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না তা সকলেই জানে। তাই অনেক রীতি ও আচার, নানাভাবে এই উৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে—যার প্রকৃত উৎপত্তি খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। ধান্তেশ্বরীর পূজা ভিন্ন, এই উৎসবে পাট দেবতা, কেশ দেবতা, জঙ্গলা দেবতা, হিঙ্গল মাতা, পরদেশী মাতা ও বাবি মাতার পূজা হয়। পাট দেবতা রৌপ্য নির্মিত পালঙ্কে বসান সর্পমূর্ত্তি এবং বাস্তারে খুব জাগ্রত দেবতা বলে ওর খ্যাতি আছে। দশহরার সময়, দেশবাসী এই দেবীর নিকট দুগ্ধ, কলা ও অন্যান্য সুস্বাদু ভোগ স্থাপন করে পূজা দেয়।

অপরাহ্নে ধান্তেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিয়ে বাস্তার রাজ হস্তিপৃষ্ঠে, কাচিন দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন। অগণিত জনতা এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। পূর্বেই কাচিন দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে রাজাকে অভ্যর্থনা করার বন্দোবস্ত থাকে। মন্দির প্রাঙ্গনে পূর্বেই একটী দোলা বসান হয় এবং দোলার আসনে বেল কাঁটা স্তরে স্তরে সাজান থাকে যাতে কণ্টকাসনে বসা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়। রাজা হস্তিপৃষ্ঠ হতে নামলে সাত আট বৎসর বয়সের একটী মাহারা

কন্যা চারিদিকে পরদা বেষ্টিত হয়ে দোলার নিকট উপস্থিত হয় এবং তার সঙ্গিনীরা কাচিন দেবীর গুণ কীর্তন করে। এই মাহারী কন্যা পূর্বেই কাচিন দেবীর পুরোহিতের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যদিও এই বিবাহ কতকটা দাক্ষিণাত্যে তালীকেতু বা সম্বন্ধন বিবাহের মত। পুরোহিত ঠিক স্বামীত্বের সমস্ত অধিকার দাবী করেন না, কিন্তু মেয়েটীর ও পুনর্বার বিবাহ হয় না। যখন ইনি যৌবন প্রাপ্তা হন তখন নিজের ইচ্ছামত অন্য কোনও ব্যক্তিকে নিজের জীবন সঙ্গী করতে পারেন এবং করেনও। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই তার প্রকৃত স্বামী, কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম বিবাহ হয় না কারণ পূর্বেই মেয়েটী বিবাহিতা। মেয়েটী দোলাটিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে সঙ্গিনীদের হাত থেকে একটী তলোয়ার ও ঢাল গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে যুদ্ধসাজে সজ্জিত একজন তেলী মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে এক মাহারা কন্যাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এই তেলীর সহিত মাহারা কন্যার দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ হয়। ক্রমে ক্রমে মাহারা কন্যার মুখে ফেনা ওঠে, সমস্ত শরীর কম্পিত হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং সমস্ত শরীর বিবর্ণ ও শক্ত হয়ে যায়—তেলী এখন পরাজিত হয়ে মাহারা কন্যার পাদুকা স্পর্শ করে এবং পরে মেয়েটীকে দোলার উপর শায়িত করায়। এই অবস্থায় মেয়েটী প্রায় ১৫ মিনিট স্থির নিশ্চল ভাবে কাটায় এমন কি জীবিত কি মৃত তাও বুঝতে পারা যায় না। রাজা পূজারীকে দেবীর নিকট প্রার্থনা করতে বলেন, যেন দশহরা উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। পূজারীর আবেদনে, মেয়েটী যেন প্রাণময় হয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে নিজের গলা হতে একটা ফুলের মালা খুলে পূজারীর হাতে দেয়, পূজারী মালা রাজার গলায় পরিয়ে দেয়। মেয়েটী আস্তে আস্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে, আশীর্বাদ পেয়ে রাজা ত্বরিতপদে দরবার গৃহাভিমুখে অভিযান করেন।

দরবার গৃহে কাচিন দেবীর আশীর্বাদের কথা সভাস্থ সকলের নিকট বিবৃতি করেন। তখন রাজপুরোহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচার করে দশহরা উৎসবের নানারকম যাগযজ্ঞ পূজা ও বলীর সময় নিরূপণ করেন। এই অনুষ্ঠানপত্র ধান্তেশ্বরী দেবীর নিকট পড়ে শোনান হয় এবং ঢোল পিটিয়ে প্রজাবর্গকে জানান হয়।

রাজা তখন সমগ্র স্বজনদের সমক্ষে দেওয়ানকে রাজত্বের ভার অর্পণ করেন এবং নিজে যাতে সম্পূর্ণরূপে দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন। মহামূল্য পরিধান ত্যাগ করে সামান্য যোগীর বেশ গ্রহণ করেন, একখানা পরিষ্কার ধুতি ও চাদর পরেন, মাথায় সুবেশ শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করে ফুলের মালা জড়ান, এবং নগ্নপদে দেবীর ঈপ্সিত কাজে লিপ্ত হন। এমন কি এইসময়ে রাজা কোন ও যান-বাহন চড়েন না বা কাউকে প্রণাম করেন না বা কারও প্রণাম গ্রহণ করেন না।

মধ্যরাত্রে, পৌরজনের সঙ্গে রাণী ও তাহার সহচরীরা জল নিমন্ত্রণ করতে যান এবং জলপূর্ণ কলসী দেবী ধান্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে মণ্ডলে ও দরবারগৃহে স্থাপন করেন। দ্বিতীয়

দিন বরুণ দেবের পূজা হয়। অপরাহ্ণে রাজা মাওয়ালী দেবীর মন্দিরে যান এবং সেখানেও কলস স্থাপন করা হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গনে কালাঙ্কী দেবী ও অনেক দেবদেবীই আছে। রাজা প্রত্যেক মন্দিরেই পূজা করেন। দরবার গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে সেই রাত্রেই রাজা একজন যোগীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজার অঙ্গরক্ষী হালবা সেনারা, উহাদের মধ্য হতে একজনকে এই কাজে ব্রতী করায়। এই যোগীর কাজ রাজার প্রতিনিধি হিসাবে নবরাত্র কঠোর জীবন যাপন করা। রাজা অমাত্যদের সামনে এই যোগীকে নিজের সিংহাসনে স্থাপন করেন, যতদিন যোগী রাজপ্রতিনিধি হিসাবে থাকে, ততদিন এক অবস্থায় বসে থাকতে হয়। দরবার গৃহের মধ্যে একটী গর্ত করে যোগীকে রাখা হয় তার উরুর উপর একখানা কাঠ রাখা হয়, তার মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য, আর একখানা সোজা দাড়ান কাঠের সহিত বেঁধে দেওয়া হয়। এবং তাকে দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হয় যে একই অবস্থায় যেন সে নবরাত্রি অতিবাহিত করে। তাকে প্রায়ই অভুক্ত রাখা হয়, যদি একান্ত দরকার হয় তবে, কিছু দুধ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় থাকার পুরস্কার স্বরূপ পূর্বে যোগীকে না-খারাজ গ্রাম দেওয়া হত। এখন কাপড়, টাকা ও খাদ্য দিলেই হয়। যোগী যখন দরবার ঘরে অমনি আবদ্ধ থাকে, রাজপরিবার তাদের নিজ নিজ কাজে মন দিতে পারে, রাজাও একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। যে কৃচ্ছসাধন রাজার করা উচিৎ ছিল, যোগীই তা করে তাতেই রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ হয়। নবরাত্র পার হলে, যোগীকে মুক্ত করা হয়, কিন্তু যোগীকে এমন ভাবে রাজধানী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, যেন প্রজারা বা রাজপরিবারের লোক পরে ঐ যোগীকে ঐ বেশে না দেখেন।

নবম দিবসে ধান্তেশ্বরীর মন্দির হতে তলোয়ার ও দেবীর মূর্তি রাজধানীতে শোভাযাত্রা সহকারে আনা হয়, এবং রাজা পৌরজন ও অমাত্যদের সহিত দেবীকে ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। মহা ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা দরবার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা শেষে, রাজপুরোহিত রাজার পুনরভিষেকের সময় জ্ঞাপন করেন এবং ১০ দিনের দিন রাজা নানা রত্নবিভূষিত হয়ে দরবারে অভিষিক্ত হন, এবং দেওয়ানের নিকট হতে রাজকার্য ভার গ্রহণ করেন। এই দরবারে সমস্ত প্রজাগণ, নাগরিক ও রাজ্যের কর্মচারীরা রাজাকে অভ্যর্থনা করে। স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা, ধান্য ইত্যাদি নানা উপহারে রাজাকে অভিনন্দিত করা হয়, রাজা উচ্চনীচ সকলের সহিত কোলাকুলি করেন এবং পান সুপারি ও মিষ্টি বিতরণ করেন।

এগারদিনের দিন রাজাকে সন্ধ্যাকালে তাঁর বন্য প্রজারা চুরি করে জঙ্গলে নিয়ে যায়। রাজাকে অসভ্য প্রজারা বনে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ভক্তিভাবে পূজা করে, এই তাদের দশহরা উৎসব। যদিও কতকটা অতর্কিতে রাজাকে সরিয়ে ফেলা হয়, রাজা এই অবস্থার জন্য প্রস্তুতই থাকেন, এবং তাঁর দিক দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। কতটা

বিশ্বাস রাজা বন্য প্রজাদের উপর ন্যস্ত করেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয়। বন্য প্রজারা বনে জঙ্গলে শীকার করে নানারকম বন্য ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে রাজাকে তাদের আনন্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করে। এই চুরির প্রথা বহুদিনের।

রাজা রাজধানী থেকে এইভাবে অপহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা রাজার অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠে—এবং রাজধানী হতে হালবা সেনা পাঠান হয়, রাজাকে নিয়ে আসার জন্য—বিরাট রথে শোভাযাত্রা করে, মহা ধুমধামের সহিত বন্য প্রজাদের সঙ্গে —রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন—প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন পতাকা শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বর্ধন করে। তীর-ধনু হাতে ভাতরা প্রজা ও মুরিয়ারা মুরুব্বিয়ানা চালে শোভাযাত্রাকে পরিচালনা করে—এবং উচ্চনীচ, উন্নত-অনুন্নত, কোনও প্রকার প্রভেদ থাকে না, মনে হয় যেন সবাই এক জাত, এক গোত্রসম্ভূত, যেন একই বংশ এই প্রতীয়মান হয়।

সভ্য অ-সভ্যের প্রভেদ থাকবেই। কৃষ্টির পার্থক্য থাকা খুবই সম্ভব। সংস্কারের বিভিন্নতা শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন কৃষ্টির সামঞ্জস্য হ'তে পারে না—একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রমূলক বা বংশমূলক জাতির স্থান হবে না—এটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন গোত্রমূলক বা বংশমূলক জাতি থাকবেই—সমাজ গড়ে তুলতে হলে স্তরে স্তরে সমাজের গঠনমূলক আচার নিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান নিয়ে তা করতে হবে। বিভিন্ন সমাজের সুষ্ঠু সুন্দর আচার ব্যবহার রীতিনীতি নিয়ে সমাজ গড়াই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাতে সভ্য ও অসভ্য সমাজ দুইএরই অবদান থাকবে। যারা এই সামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে কাজ করেন তারা সমাজের কল্যাণ চান না বিভিন্ন কৃষ্টির সংযোগে যে কৃষ্টি গড়ে উঠে—তার মূল্য সমাজ সংস্কারকেরা যেন উপলব্ধি করেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

হে সৈনিক তোমার লাগিয়া

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হে সৈনিক, তোমার লাগিয়া।
যুদ্ধ যবে হবে শেষ, চন্দ্র অস্ত যাবে,
রাজপথে উদ্বেজিত কুয়াসা মিলাবে,—
ধোঁয়ায় পাণ্ডুর রাত্রি রহিবে না আর,
ধূলায় ছড়ায়ে র'বে সমর-সম্ভার ;—
নিয়তির লিখন-লিখিত সমাধির লাল মৃত্তিকাতে,
সেই দিন শান্ত ক্ষণে কে তোমারে আসিবে জাগাতে!
হে সৈনিক, তোমার লাগিয়া,—
শুধু জানি,—প্রান্তরের রক্তরেখা শ্যাম পর্ণে উঠিবে শ্বসিয়া।

রাত্রিরে ডাকিয়া কহি, রাত্রি, কথা বলো, কথা বলো,—
অজ্ঞাত মহত্ত্ব তরে কী মূল্য রহিলো?—দিন গেলো।
বিজয়-মশালবাহী সে দিন তো লীন আছে এখনো আঁধারে
এখনো অনেক যাত্রা, বহু দুঃখ, বহু রক্তপারে।
বিরতি-পতাকা যবে সেই ক্ষণে ভাসিবে বাতাসে,
অনেকে ভুলিবে তারে, দু'একে স্মরিবে দীর্ঘশ্বাসে।
হে সৈনিক, তোমার লাগিয়া,—
সমাধি-উৎসব-দীপ রচি এই কথা দু'টি দিয়া।
কাকুতি করো না বন্ধু, জীবিতের প্রশংসা লাগিয়া ;—
ধরণীর কেন্দ্র, যেথা হ'তে ফুল ওঠে উৎসারিয়া,
সেথায় শয়ান র'বে অনন্ত-প্রহর ভরা রাতে,—
দেখিবে, কেমনে কীর্তি পূর্ণ হয় মৃত্যুকরঘাতে।

মহা বসন্ত

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

লোহার গরাদ কামনা পংগু করে,
বন্দী-জীবনে সূর্যের আলো ক্ষীণ।
শংকিত-ভয় মাটি চাপা দিয়ে রাখে
যতো অংকুর কামনার—বাসনার।

বাসর ঘরের দেয়ালে ছায়ারা নড়ে ঃ
তাহাদের কাছে শুনো যতো ইতিহাস।
চারণ-গীতির আজো অনাগত কাল ঃ
ছায়াদের চোখ গলিত রক্তে লাল।

নীলাভ স্বপ্ন আঙুর বনের ধারে ?
আজ বুঝি আর ভালো লাগে এই চাঁদ ?
মাটির ফসল জমিদার নিয়ে গেলে
কাহাদের কাঁপে অকর্মা ভিরু হাত ?

কর কংকণ কপালে কঠিন ঠুকে
পত্রলেখার বিরহ স্মরণ ক'রো।
সেই ভালো আজ দহন শান্তি হোক ঃ
মিলনে আজিকে অবসাদ অতিতম।

কোথা ধনুশর ? যুদ্ধ চলেছে তবু ঃ
সাইরেণ কাঁদে বায়ুমণ্ডল ঘিরে কি ?
দেয়াল-ছায়ারা চুপি চুপি মাথা নাড়ে ঃ
ভবিষ্যতের ইতিহাসও জানে তারা ?

মহামানবের সাগরের বন্দর ঃ
মহাকাল চায় নিজেই মেটাবে দেনা।
শিরীষ কুসুম, মহাবসন্ত এলে
অত্যাচারিত আর কভু কাঁদিবে না।

শুরুপাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে শান্ত মাঠে উড়ে আসে শুরু পাতাগুলি।
আর মনে পড়ে
দিনের পাহাড়ে আমি ভারি।
মনে পড়ে যে ঝড় একদিন সম্মান দিয়েছিলো
সে ঝড় শেষ।
মৃত্যুর মত একে একে শুরু পাতা আমাকে ঘিরে
আমার শান্ত মাঠে।

শীতের শুরু অরণ্যে অকস্মাৎ
কতবার খাপছাড়া হলুদ ফুলের ভীড় দেখেছি।
তখনো সময় হয়নি বসন্তের ঝলোমলো সূর্যের।—
শুধু পৃথিবীর অসহ্য আশ্চর্য দিন
কঠিন নীল আকাশের নীচে উদ্ধত হয়ে ছিলো।
তারা আজ পাংশু পাতার ছায়ায়
আমার শান্ত মাঠে
এলোমেলো।

অনেক দূরে ফেলে এসেছি,
আজ হয়তো মনে পড়ে
হয়তো খানিক আগ্রহে কেঁপে ওঠে
মনে হয়—মরিনি।

কিন্তু এই সব রাশি রাশি অজস্র শুরু পাতায়
আমার পৃথিবী ঢেকে যায়।
দিনের পাহাড়ে আমি ভারি।

উত্তর মেরু

করুণাময় বসু

কানন শিয়রে রয়েছে আঁকানো রাঙানো বাঁকানো চাঁদ,
যেন বিহঙ্গ অঙ্গ মেলেছে নভে ;
সুদূর বিসারী পথের প্রান্ত, আকাশে অনেকরাত,
সঙ্গ তোমার যাত্রা-পাথেয় হ'বে।

তুমি আর আমি কালের নদীতে পাশাপাশি দু'টি তীর,—
কোথায় মিলিব আঁধারে জানেনা কেউ ;
এই ক্ষণটুকু পান্থ-পাখীর ক্লান্ত করুণ নীড়,—
কখন ভাঙিবে, অদূরে সাগর ঢেউ।

প্রাণের পাত্র ভেবোনা বন্ধু সফেন তরঙ্গিত,
কোন অলক্ষী ফিরিছে পথের বাঁকে ;
নিমিষে ফুরাবে প্রণয়-নাটিকা ভূমিকা সম্বলিত,
লক্ষীছাড়ুরে অলক্ষ্য হ'তে ডাকে।

তুমি যেন কোন মরুর আকাশে সুদূরের শুকতারা,—
নিম্নে সাগর, বাঁধিবে কে বলো সেতু ?
পার হয়ে গেল উত্তর মেরু যাযাবর পাখী যারা
গৃহবন্ধনে বাঁধিবে তারা কী হেতু !

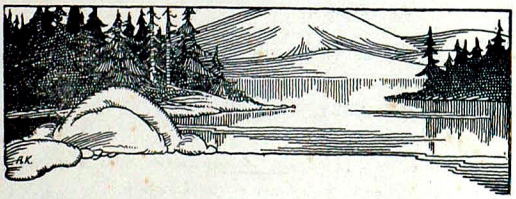

পুত্রী

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে রাত্রে মৈত্রীর ভাল করে আহার হল না। মৃত্যুঞ্জয়ের জ্বর অল্পই ছিল, কাজেই পিতার-শারীরিক অবস্থার জন্য যে কন্যার রাত্রির আহারের ব্যাঘাত হয়েছিল, তা নয়—সে ব্যাঘাত হয়েছিল নিজের উপর মৈত্রীর একটা অন্তর্নিহিত ক্রোধ জন্মাতে এবং সেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছিল কিরীটের সেই সন্ধ্যাবেলাকার গোটা কয়েক কথায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৈত্রীর মনে কেবলই তর্ক উঠল সে যে তাঁর পিতার অর্থে পরিপুষ্ট হচ্ছে, সেটা কি তার পক্ষে খুব অন্যায় ? মৈত্রী যতই ভাবতে লাগল ততই সে আশ্চর্য বোধ করতে লাগল যে এ চিন্তাটা এতদিন তার মনে একবার উঠে নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবিকা-হীনতা আর ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারের মধ্যে রইল না, সে একেবারে ঠিক ক'রে ফেলল যে তাকে যতটা সম্ভব একটা উপার্জনের পথ খুঁজে বার কতেই হবে। পরীক্ষায় মৈত্রী ম্যাট্রিকের কোঠা-ও পার হয় নাই, কাজেই এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পার্‌ল যে টিচারি, যা মেয়েদের সব চাইতে বেশী মেলে, সেটা তার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে না! উষ্ণ মস্তিষ্ক ঘণ্টাখানিক আলোড়ন করেও মৈত্রী সে রাত্রে কোন উপার্জনের পথ মনে মনে স্থির করে উঠতে পার্‌ল না।

পরদিন সকালে মৈত্রীর নজর পড়ল এক দেশী ইংরাজী কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা ই আই রেলওয়ে কোম্পানীর চাকুরীর বিজ্ঞাপনে। এ'তে দুটী মহিলা টিকেট-বিক্রেত্রীর পদ-খালির কথা ছিল। মৈত্রী বিজ্ঞাপনটা পড়েই পিতাকে জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, বাবা, এই ই, আই, আর, কোম্পানী টিকিট-বিক্রেত্রীর কাজে বাঙালী মেয়েদের নেয় না ?"

মৃ—বোধ হয় নেয় না।

মৈ—কেন নেবে না, এ বিজ্ঞাপনে ত কিছু লেখে নাই যে শুধু এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদেরই নেবে ?

মৃ—তা হ'লে হয়ত বাঙালী মেয়েদেরও নেয়, দেখেছিও বোধহয় দু একজন। তা তুই খোঁজ নিচ্ছিস কিসের জন্য ?

মৈ—আমি ভাবছি এর জন্য উমেদার হব।

মৃ—ক্ষ্যাপা মেয়ে !

মৈ—বাবার যে কথা ! ক্ষ্যাপামোটা কিসে হল বল দেখি ? আমায় ত তুমি আর দশটা পরীক্ষায় পাশ করাওনি যে আমি অন্য কোন কাজ করে উপার্জন করব ?

মৃ—তোর কিছু কর্তে হবে না, মিতি মা।

বলে মৃত্যুঞ্জয় মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার চিবুকে ছড়ান চুলটা মাথায় তুলে দিলেন। মৈত্রী আর কোন কথা বল্‌ল না।

দিন সাতেক বাদে মৈত্রী পিতাকে জানাল যে তার ই আই আর কোম্পানীতে বেরিলীর, অফিসে টিকেট-বিক্রেত্রীর কাজে নিযুক্তি হয়েছে এবং সামনের মাসের পয়লা তারিখে অর্থাৎ প্রায় আরও বারো দিন পরে তাকে সেই কাজে লাগ্‌তে হবে। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমটা শুনে হেসে উঠলেন এবং পরে যখন ব্যাপারটা যথার্থ বলেই বুঝতে পার্লেন, তখন উপস্থিত ক্রোধের হাত থেকে এড়াবার জন্য বল্লেন "এ সম্বন্ধে রাত্রে কথা হবে।" সে দিন সায়াহ্নে শ্রীমন্ত-কিরীট দুজনই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে এসে খবর পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে মৃত্যুঞ্জয় পদব্রজে একাকী বেড়াতে গিয়েছেন এবং মৈত্রী গেছে পাড়ার এক বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রাইজ-সভায়।

মৃত্যুঞ্জয় সেদিন সন্ধ্যাবেলা দারুণ মনোক্ষোভে গোটা রাসবিহারী এভিনিউটা একা একা ঘুরে বেড়ালেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে কন্যার উপার্জনচেষ্টায় যতটাই আঘাত লাগুক না কেন, এটা ঠিকই বুঝতে পারলেন যে মৈত্রীর আচরণে গর্হিত কিছুই ছিল না। উপার্জন-চেষ্টা ত কিছুই নিন্দনীয় নয়, মেয়েদের পক্ষেও তাহা অ-প্রাঘার ব্যাপার হতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ের শুধুই মনে হতে লাগল যে কন্যা একবার ভেবেও দেখল না যে তার এই কর্ম্ম-চেষ্টাতে পিতার মনে কতটুকু আঘাত লাগ্‌বে। মেয়ের নিজের কর্তৃত্বাভিমান হয়ে থাকে ত হৌক—মৃত্যুঞ্জয় নিজেই ত কতবার কন্যাকে আত্ম-নির্ভরশীল হতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু পিতার মনের দিকটা কেন মৈত্রী তলিয়ে দেখ্‌ল না? মৈত্রী কি জানেনা যে তার পিতার কর্ম্মজীবনের আর্থিক প্রেরণা ছিল সে নিজেই, মৈত্রী কি জানে না যে সে পিতার জীবন-নেত্রের মণি—তার কোন অর্থের প্রয়োজন নাই, তার সম্বন্ধে কোন উপার্জনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধের এক একটা করে মাতৃহীনা শিশুকন্যার বহুদিনকার ছোটখাট অনেক ঘটনা মনে পড়তে লাগ্‌ল। ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের আহত প্রাণের মেঘ-ভার উচ্ছ্বসিত স্নেহ-বাত্যায় উড়ে গেল। তিনি ঠিক কর্লেন যে তার কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করা নিতান্তই অনাবশ্যক, কেন না মিতিকে বুঝিয়ে বল্লেই চলবে যে তার উপার্জন-চেষ্টায় পিতার মনে নিদারুণ আঘাত লাগ্‌বে। মনের এই সহজ ভাবটা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় যখন ল্যানসডাউন রোড একটেনশনে কয়েক পা এগিয়েছেন, অমনি সাক্ষাৎ হল নিস্তারণ মিত্রের সঙ্গে।

নিস্তারণ—এই যে ভায়া মৃত্যুঞ্জয়। তোমার কথাই আজ বিকালে গিন্নির সঙ্গে হচ্ছিল। বলি তোমার এক-রত্তি মেয়েটার কিছু গতি কর্লে? যদি না করে থাক, তবে ভায়া এখনও বলছি ভেবে দেখো নিখিলের সঙ্গে সম্বন্ধটা।

মৃ—তোমায় ত বলেছি, নিস্তারণ, যে মেয়ে আমার রাজি হয় না!

নি—সব ব্যাটাবেটী কি একই ঠাকুরের গড়া?

মৃ—কেন হে, চট্‌ছ কার উপর?

নি—কার উপর আর—এই হারামজাদা আমার এই ডেপুটী মুর্খের উপর। খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল হে, বড় এটর্ণীর একমাত্র মেয়ে-সন্তান। তাড়াতাড়ি করে ব্যাটার নামে ১০০০০৲ টাকার একটা বীমা করিয়ে premium অবধি দিলুম। এখন শ্রীমান কুম্মাণ্ড বলে কিনা মেয়ের বাপের চরিত্র দোষ। দোষ হয় ত বুঝবে তোর শ্বাশুড়ী, তোর ব্যাটার কি? হ্যাঁ?

"কি আর করা যাবে" বলে মৃত্যুঞ্জয় কথা শেষ করে পথ হাঁটতে লাগ্‌লেন।

পিতার স্নেহ-বিগলিত কাতরোক্তিতে কন্যার প্রতিজ্ঞা শিথিল হল না। মৃত্যুঞ্জয় যখন মৈত্রীকে বুকে টেনে বল্লেন, "মিতি, তুই আমাকে এ ব্যথা দিস্ নে মা", উত্তর হল "তুমি যদি অন্যায়-ভাবে ব্যথা পাও, তবে আমি কি কত্তে পারি বল"? মৃত্যুঞ্জয় কন্যার ঘাড়ে বেষ্টিত নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন আর কোন কথাই বলতে পার্লেন না। দুশ্চিন্তায় এবং আহত অভিমানের বেদনায় সে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় এক প্রকার বিনিদ্র ভাবেই কাটালেন। পরদিন মৃত্যুঞ্জয় ক্রমে ক্রমে শ্রীমন্ত ও কিরীটের শরণাপন্ন হলেন। মৈত্রী কড়া কথায় শ্রীমন্তকে ইচ্ছা করে অপমান করার জন্যই বল্ল "মাষ্টারিতে বুদ্ধি লোপ পায় তা আগেই জান্তাম। আপনি না কতবার বলেছেন যে জীবনে প্রত্যেকের আদর্শ স্বতন্ত্র, তবে কেন এখন আমায় বাবার দিক থেকে ভাবতে বল্‌চেন"? কিরীট এসে বল্লে "মৈত্রী, রোজগার করবে ভালই, তবে কি জান মেয়েদের রোজগারে সমাজের আর কারোই উপকার হয় না ততটা, যতটা হয় শাড়ী-ওয়ালার। এই একচোখোমিটা বাঁচিয়ে চলতে পারবে ত?" মৈত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর ত্যাগ কর্ল। মৃত্যুঞ্জয়ের সমস্ত সুপারিশ ও অনুনয় অগ্রাহ্য করে মৈত্রী ই, আই, আর এর চৌরঙ্গীর অফিসে কাজে হাজির হ'ল।

বিদ্রোহী কন্যার নির্মম আচরণের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় দিন কাটাতে লাগলেন। পিতাপুত্রীর খাওয়া দাওয়া পূর্ববৎই এক সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌ল, খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা তেমনি পিতাপুত্রীর প্রশান্ত জীবন-যাত্রাকে বাক্য-বহুল করে তুলতে লাগল, কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে তেমন ভাবে আর সান্ধ্য-বৈঠক জম্‌ত না। তার কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ, মৃত্যুঞ্জয় কন্যার চাকুরী গ্রহণের পর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে বেরিয়ে যেতেন, কোন কোন দিন বা কন্যাও সঙ্গিনী হত। দ্বিতীয়তঃ, আগন্তুকদেরও ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছা অনেকটা মন্দীভূত হয়ে এল। তৃতীয়তঃ পিতাপুত্রী বাড়ী থাকলেও এবং শ্রীমন্ত-কিরীট বৈঠকে উপস্থিত থাক্‌লেও যেন আলাপ-আলোচনায় পূর্বেকার সরসতার অভাব লক্ষিত হত। মানুষের মন প্রকাশ্য বিরোধে যতটা না ছন্দহীন হয়ে পড়ে, তার চাইতে ঢের বেশী হয় অপ্রকাশ্য বিরোধে।

সান্ধ্য-মিলনের প্রসন্নতা মন্দীভূত হ'ল বটে কিন্তু মৈত্রীর কর্ম-জীবনের সূত্রপাত হতে তার প্রতি কিরীটের অনুরাগ গেল অনেকখানি বেড়ে এবং সে অনুরাগের প্রকাশও হ'ল কিরীটের স্বভাবানুগত বিকৃত-রূপে। কিরীট সুযোগ পেলেই বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে চৌরঙ্গীর কাউণ্টার এ গিয়ে তাঁদের জন্য টিকেট কিনে দিত এবং সেই সময় বিক্রেত্রীকে তাঁদের কাছে বন্ধুস্থানীয়া বলে পরিচয় করিয়ে দিত। পরিচয়ের এ রকমটা মৈত্রীর মোটেই ভাল লাগল না। তবুও হয়ত কিরীটের প্রতি তার ক্রোধ হ'ত না, যদি না বীমার দালালটী প্রায় দিন সাতেক কাউণ্টারে যাবার পর একদিন গিয়ে মৈত্রীকে তার আফিসের মান্দ্রাজী কর্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য প্রস্তাব না কর্ত। মৈত্রী সরোষে সে প্রস্তাবেতো অস্বীকৃত হ'লই, তার পর দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনেই কিরীটকে এই প্রকার আলাপ করিয়ে দেবার ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ভৎসনা কর্ল। কিরীট এতে অপ্রতিভ বোধ না করে হেসে বল্ল "এটা বুঝছ না কেন মৈত্রী যে বীমার কাজটা আমার সখের ব্যাপার নয়"। মৈত্রী শুনে ক্রোধের আতিশয্যে কথা কইতে না পেরে গৃহান্তরে চলে গেল।

মৈত্রী জেদের মাথায় ও নিজের বিচার-বুদ্ধিকে চরিতার্থ করবার একান্ত ব্যগ্রতায় চাকুরী করতে এল বটে কিন্তু টিকেট অফিসের হালচালটা তার আদৌ ভাল লাগল না। যন্ত্রচালিতের মত ছ-সাত ঘণ্টা টিকেট হাতড়ান ও পাঞ্চ করা কাজটায় যত অবসাদই থাক্, মৈত্রী সেটাকে কোনরকমে বরদাস্ত করতে পারত। কিন্তু সব চাইতে তাকে পীড়া দিত সমস্ত আফিসের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী মেয়ে বলে তার উপর পুরুষ-কর্ম্মচারিদের কৌতূহলী দৃষ্টি এবং টিকেট ক্রয়েচ্ছুদের গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা। লজ্জাশীলতা বল্লে যা বোঝায়, মৈত্রী কোনকালে সে হিসাবে লজ্জাশীলা ছিল না। তার নারীত্বের প্রতি কোন আঘাত হলে সে তাকে প্রতিঘাত না কর্লেও উপেক্ষাই করত। কিন্তু কাউণ্টারের পাশে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে মৈত্রীর যেন সেই আগেকার স্বাভাবিক তেজস্বিতায় ঘাটতি পড়ল। এইরূপ মানসিক পীড়ায় সপ্তাহ তিন কাটলে পর, মৈত্রীর সৌভাগ্যক্রমে টিকেট-অফিসে একটী দ্বিতীয় বাঙ্গালী মেয়ে নিযুক্ত হল—নাম দুর্গাবতী দত্ত। মেয়েটীকে দেখে মনে হত মৈত্রীরই সম-বয়স্কা, যথার্থ দুর্গার বয়স ছিল উনিশ কি কুড়ি। নব-নিযুক্তাকে মান্দ্রাজী-কর্তা মৈত্রীর কাছে সাত দিন কাজ শেখাতে দিয়ে গেলেন, মৈত্রী জিজ্ঞাসা কর্ল, "আপনার নামটা কি—জানা যে দরকার।"

"দুর্গা।"

"দুর্গা কি?"

"দুর্গাবতী দত্ত।"

মেয়েটীর সাজ-সজ্জার প্রাচুর্য্য দেখে মৈত্রীর প্রথমটা দুর্গাকে ভাল লাগেনি, তার ওপর নিজের নামটা যে মেয়ে ভাল করে বলবার ভদ্রতা জানে না, সে আবার কাজ করতে এসেছে ভেবেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

কিন্তু দুর্গা সম্বন্ধে মৈত্রীর প্রথম দিনের বিশ্রী ভাবটা ক্রমশাই কমতে লাগল। কারণ দ্বিতীয় দিন থেকেই মেয়েটী হয়ে পড়ল একেবারে মৈত্রীর প্রতি শ্রদ্ধানতা।

সে বল্ল, "আপনি আমায় দুর্গা বলেই ডাকবেন কিন্তু আমি ডাকব আপনাকে মৈত্রীদি।"

"আমার নাম মৈত্রী কে বল্লে? এ নামে ত অফিসে কেউ ডাকে না, আমিও তোমায় বলিনি?"

"তা আমি জানি।"

ব্যক্তিস্বাভিমান যাঁদের তীব্র, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারে তাদের মনের ওপরে পড়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ। মৈত্রীরও দুর্গার শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে হল তাই—সে এই নব-পরিচিতা, বেশী-বিলাসিনী অ-মার্জ্জিত-ভাষিনীর প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়ল। মৈত্রী তাকে উঁচু গোড়ালির জুতা ছাড়িয়ে নাগরাই ধরাল, উৎসারিত হাসিকে খর্ব করে খাটো রুমালের নূতন ব্যবহার শিখাল, দুর্গার দন্তাস-এর উচ্চারণটা নির্ভুল ও সরস করে তুললো। আশ্চর্য যে, দিনের পর দিন এই গুরু-বৃত্তিতে মৈত্রীর ধৈর্য বিদ্রোহী হল না এবং রুচির দিক থেকেও এই অনুন্নত মনের সংস্পর্শে তার ক্লান্তি এলো না।

মাসখানেকের ভিতরই দুর্গার চরিত্রের ও জীবনের ষোল আনা পরিচয় পেয়ে গেল। দুর্গা মনে করত তার জীবন অভিশপ্ত, কেননা তার নিজের কোন পিতৃ-পরিচয় ছিল না; মাতার মৃত্যুও তার কাছে ততখানি শোকের ব্যাপার ছিল না, যতটা ছিল মাতা-মাতামহীর পঙ্কিল জীবনের গ্লানি। দেহকে আঘাত দিবার জন্য দুর্গার দিদিমা তাকে যতটা লেখাপড়া শিখিয়েছিল, সেটুকুন লেখাপড়াই তার অন্তরের ঠাকুরকে তখন পিষে মারছিল। নিজের ক্ষুদ্র জীবনের বছর দুয়ের কথাও দুর্গা না শিউরে ভাবতে পারত না। কিন্তু তবু ভাল যে বিধাতা সেই ঘোর দুর্দিনেই পাঠিয়েছিলেন তাঁর মঙ্গলদূত। এ সব কথা যে দুর্গা ঠিক মৈত্রীকে মুখ ফুটে বল্ল তা নয়, তবে মৈত্রীর অবিকৃত স্বরের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও দুর্গার অশ্রুরুদ্ধ গলার আত্মানুশোচনা মিলে যে সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী দাঁড়ায়, তা মোটামুটি এই প্রকারের। যেদিন চৌরঙ্গীর ময়দানে দাঁড়িয়ে দুই সহকর্ম্মিনীর বেশী খোলাখুলি ভাবে কথা হয় সেদিন ছিল শনিবার। বাড়ী ফেরবার পথে আধঘণ্টার মত কথা হবার পর দুর্গা হঠাৎ মৈত্রীর প্রায় পা জড়িয়ে ধরে বল্ল,

"মৈত্রীদি, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে ঘৃণা করো না।"

মৈত্রী তাড়াতাড়ি পা'টা সরিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে ব'ল্ল "ও কি করছ, দুর্গা, এ মাঠের মাঝে অভিনয়! তুমি কি করেছ যে আমি তোমাকে ঘৃণা করব? তোমার মা দিদিমার কাজের জন্যত আর তুমি দায়ী নও।"

"আমার মধ্যে ত তাঁদেরই রক্ত। তা ছাড়া আমিই বা——"

"থাম, দুর্গা, থাম। ধনী লোকে টাকা খরচ করে যা করে, তার জন্য ঘৃণ্য হয় না, আর ঘৃণ্য হবে তুমি, তোমার মা, যারা টাকার জন্য ঐ একই কাজ করে। এ সব বুজরুগি আমার কাছে বলতে এসো না। যাও এবার বাড়ী পালাও, আমিও যাচ্ছি।"

সেদিন মৈত্রীর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবার একটা বিশেষ কারণ ও ছিল, কারণ সেদিন ছিল সন্ধ্যার পর বোসেদের ওখানে স্বামীর সঙ্গে রত্নার আসার কথা। প্রায় বছর দুই হল রত্নার বিয়ে হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই দিনই রত্না প্রথমে আসছে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে। রত্না যে কখনো মৈত্রীর বাড়ীতে আসে নি কিংবা মৈত্রীও যে কখনো রত্নার বাড়ীতে যায়নি তার কারণ ছিল রত্নার স্বামীর পরিচিতদের প্রতি অনুরাগের একান্ত অভাব। রত্নার স্বামী ছাড়া যে সংসার ছিল, তা'তে ছিল ওর মা, ভাই, বোন ইত্যাদি, বড় জোর ওদের বিয়ের আগেকার দুচার জন বন্ধু। শ্রীমন্তের স্ত্রীর কুর্ম-স্বভাবটা বেশ জানা ছিল, কাজেই স্ত্রীর কথা বোসেদের বাড়ীতে অনেক উল্লেখ করলেও কখন ও স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে যায় নি। তা হলে ও হয়ত এমনটা হত না যদি মৈত্রীর স্বভাবটা হত সাধারণ মেয়েদের মত। নূতন বৌ দেখার যে অনুঢ়াদের সখ থাকে, মৈত্রীর সে সখ্ ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় শ্রীমন্তের বিবাহের অব্যবহিত পরে মৈত্রীকে দু'চার বার বলে ও ছিল। "মিতিমা, তোমার শ্রীমন্তের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া উচিত।"

"হবে'খন। হোক না বৌটি একটু পুরোন। এখন এলে আস্‌বেত একগা গয়না পরে। কি ন্যাকা এই বৌগুলো, যেন কিউরো দোকানের পশার। দেখে গা জ্বলে।"

মৃত্যুঞ্জয় বুঝলেনে যে কোন কারণেই হোক, কন্যা রত্নার উপর হতশ্রদ্ধা। কাজেই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর্লে ও সেটা খুব শোভন হবে না।

সে যাই হোক মৈত্রী চাকুরীতে ঢুকবার মাস দুই পরে একদিন শ্রীমন্ত স্ত্রীকে বল্ল যে ওর মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা উচিত, কেননা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটা মেয়ের ব্যবহারে আঘাত পেয়ে খানিকটা মন মরা হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন। রত্না প্রস্তাবে রাজি হল, খুলে বল্ল "ভালই বলেছ, দেখে আসা যাবে মৈত্রী বোস্‌কে ও, মেয়েটাত পথ ছেড়ে চল্‌ছে অন্য পথে"। শ্রীমন্ত সস্ত্রীক শনিবারে আস্‌বে বলে বোসেদের আগেই জানিয়ে গেল এবং মৈত্রী যখন সেদিন ময়দানের কথা বন্ধ করে বাড়ী এসে হাত মুখ মাত্র ধুয়েছে, এমনি সময় ওদের বস্‌বার ঘরে এসে হাজির হল রত্না ও শ্রীমন্ত। মৃত্যুঞ্জয় সে ঘরে ওদের জন্য অপেক্ষাই করছিলেন, মিনিট দুই পরে প্রশান্তভাবে এসে ঘরে ঢুকল মৈত্রী।

শিষ্টাচার ও প্রথামাফিক পরিচয় সমাপ্ত হলে রত্না তার ছোট চৌকিটা চেড়ে বসল গিয়ে মৈত্রীর পাশ ঘেসে, বড় কৌচেতে ও স্মিত মুখে ব'ল্ল "আপনার কথা কত শুনছি কিন্তু দেখা করা হয়ে উঠে না একটা না একটা ফ্যাসাদে।"

মৈত্রী জবাব দিল "আমার ত কোন ফ্যাসাদ নাই, তবুও আপনার সঙ্গে দেখা হল আজই প্রথম"।

মৃত্যুঞ্জয় বল্ল "তোমারই কি ফ্যাসাদ বৌমা—কি বলহে শ্রীমন্ত, আমি একে বৌমাই বলি—(শ্রীমন্ত মাথা হেট করে সম্মতি জানাল) ফ্যাসাদ মা তোমার ও কিছু নেই। তা হলে ও এটা ঠিক যে আমাদের ঘর-কন্নার যা বিলি ব্যবস্থা তা'তে মেয়েদের সময়ের উপর টান হয় অত্যন্ত বেশী। শ্রীমন্ত—একথা কেন বল্‌চেন। আমারত মনে হয় আমরা মেয়েদের খাটুনি সম্বন্ধে আজকাল অতখানি সজাগ যে তাদের সময়ের উপর আমরা অনাবশ্যক কোন দাবীই করি না।

এমনি সময় রত্না বল্ল "চলুন না মিস্ বোস, আমরা আপনার ঘরে যাই"।

মৈত্রী তাঁর বিস্ময়কে যথাসাধ্য অতিক্রম করে বল্ল "চলুন" বলে কৌচ ছেড়ে উঠ্‌ল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মেয়ে দুটীতে অনেক কথা হ'ল। রত্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অনেক কথা মৈত্রীকে বল্ল, তার মা বোনের কথা, স্বামীর গিলেদার পাঞ্জাবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, রাত জেগে পৌরানিক আখ্যান ও ইংরেজী উপন্যাস পড়ার বাতিক ইত্যাদি; এমন কি প্রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শুধু গলায় গান গাইল "ওহে সুন্দর মরি মরি! তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।" মৈত্রীর কোন কথাই খুব ভাল লাগছিল না, কিন্তু সব কথাই সে খুব বিস্ময়ের সহিত শুনছিল। রত্নার কথা বার্ত্তায় কোন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল না, তবে তাতে মৈত্রীর মতে অসাধারণ প্রকাশ ছিল। মৈত্রীর মনে ভাবটা একটা রূপক দিয়ে বলতে গেলে বলা চলে যে মানুষ যেন সবাই এক একটী নল-কূপ, বিধাতাজ্‌নের শর-সন্ধানে প্রত্যেকের বুদ্ধি ধারা বুঝি একেবারে পাতাল সর্ম্পী। কিন্তু রত্নাকে দেখে মনে হল এ যেন বর্ষার জল-পুষ্ট অগভীর বাপী-তট, তৃণ-পুষ্পের সবুজ-শ্রীতে গৌরবময় হয়ে রয়েছে। রত্নার স্বাভাবিক প্রকাশশ্রী যত কমই থাক্‌না কেন, এটা ঠিক যে মৈত্রীর সঙ্গে প্রথম রাত্রিকার সাক্ষাতে সে আপনাকে প্রকাশ করেছিল চমৎকার রূপে। তার কারণ রত্নার ধারণা ছিল যে মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে হীন বলেই বোধ করবে মৈত্রীর রূপ, গুণ ও বিদ্যা এমনি হবে। সাক্ষাতে রত্নার সেই হীনতা বোধের আশঙ্কা একেবারে গেল কেটে—রত্না তখন যেন অন্তরে অন্তরে একটা জয়োল্লাসই বোধ করতে লাগ্‌লো এবং তাই আশ্চর্য নিবিড়তার সহিত তার অপ্রকৃত স্বভাবকে ও মূর্ত করে তুল্‌ল—হাসিতে, গানে ও কথার ভঙ্গিতে।

যে রাত্রে নটায় রত্ন ও শ্রীমন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী ত্যাগ কর্ল।

দুর্গার সঙ্গে মৈত্রীর পরিচয়টা অল্পদিনের মধ্যে আরো ঘনাইয়া আসিল। শনিবারের অপরাহ্নে মাঠে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হবার প্রায় সপ্তাহ দুই বাদে মৈত্রী দুর্গাদের বিডন স্কোয়ারের বাড়ীতে অফিস ফেরবার পথে চা খেতে এল। এসে মৈত্রী বেশীক্ষণ বস্‌ল না। বন্ধু সুলভভাবে অপর মেয়েদের মত গল্পগুজব জমান মৈত্রীর ধাতে নাই, তা ছাড়া সেদিনের আসাটা হয়েছিল একেবারে আকস্মিক। দুর্গার প্রতি মৈত্রীর যতটা করুণামিশ্রিত পক্ষপাতিত্বই থাক্, দুর্গার

দিদিমাকে দেখে মৈত্রীর মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। একে ত হরমোহিনী ছিল অতিশয় স্থূলাঙ্গিনী, তা ছাড়া মেজের উপর ঢালা বিছানায় বসে সে যেমন ধারা হাতের কাছের পিকদানে প্রতিমুহূর্ত্তে পানের পিক্ ফেলছিল, তাতে মৈত্রীর মেজাজ গিয়েছিল বিরক্তিতে ভরে। ঘরে ঢুকেই দুর্গা সহকর্ম্মিনী মৈত্রীদিকে দিদিমার কাছে এবং তাঁরই অনতিদূরে অর্দ্ধশায়িত অখিলদার সঙ্গে পরিচিতা করে দিল। অখিল বিশেষ কোন কথাই আগুন্তুকার সঙ্গে কইতে পার্ল না কিন্তু হরমোহিনী মৈত্রীর সঙ্গে বিড়বিড় করে গেল মেলা। মৈত্রী যখন বল্ল যে সে গান গাইতে জানে না, হরমোহিনী হেসে হেসে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল এবং পরে অখিলকে বল্ল "শুনলে নাতি, ছুঁড়ীর কথা শুনলে, গাইতে শেখে নি। তুমি ত জান আমি আমার দুর্গাকে কের্তন শেখাবার জন্য গোস্বামী ঠোঁড়াটাকে আমার ওখানে আসবার জন্য কত খোসামুদী করেছি।"

অখিল মেজের দিকে তাকিয়েই সংক্ষেপে বৃদ্ধার কথার জবাব দিল "হুঁ"। মৈত্রী অসহিষ্ণু হয়ে দূরের চৌকি হতে উঠে দাঁড়াল, ইচ্ছা তখনই পালায়। এমনি সময় খাবারের রেকাব হস্তে ঘরে ঢুক্‌ল দুর্গা এবং পেছনে পেছনে চায়ের বাটি হাতে করে বাড়ীর ঝি। চা-খাবার খানিকটা গলাধঃকরণ করে মৈত্রী মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে দুর্গার নিকট হতে বিদায় নিল। খানিকটা অসহিষ্ণুতার জন্য ও খানিকটা বাহ্য হৃদ্যতাহীনতার জন্য মৈত্রী দুর্গাকে একবার ওর সঙ্গে বসে নিজের চা-খাবার খেতে বল্‌ল না। এমন কি ঘর থেকে বেরোবার সময় মৈত্রী অখিল কিংবা হরমোহিনীর প্রতি শিষ্টাচার পর্য্যন্ত করল না।

পলাতক

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পেরিকপ ছেড়ে যখন বেরোলাম তখন আমাদের মেজাজ যতদূর খারাপ হবার; খিদেয় অস্থির, সারা দুনিয়ার লোকের ওপর রাগে গা যাচ্ছে জ্বলে। সুদীর্ঘ বারো-তেরো ঘণ্টা কাটিয়েছি খোঁজাখুঁজি লাফালাফিতে—সামান্য কিছু খাবার যদি হাতানো যায় এই মনে ক'রে, কিন্তু সব বৃথা। শেষকালে কিছুতেই কিছু হবে না দেখে অগত্যা সামনের দিকে এগোনোই ঠিক করলাম কিন্তু কোন্‌দিকে এবং কোথায় তা' তখনও অনিশ্চিত।

এতদিন জীবনধারার যে খাত ধ'রে বয়ে এসেছি আজও সেই খাতেই বইব, একথাটা আমরা প্রত্যেকেই মৌনভাবে স্থির ক'রে নিলাম,—ক্ষুধিত চোখের ম্লান দৃষ্টিতে সহজভাবে জ্বলজ্বল করছিলো সে কথাটা, আমাদের তিনজনের ভাব হয়েছে খুব বেশী দিন নয়; তা' হয়েছিলো

নীপার নদীর তীরে খার্সন সহরের একটা মদের দোকানে। একজন আগে কাজ করত রেলসৈন্যদলে পদাতিক সৈনিকের, পরে বোধ হয় ভিসচুলা রেল কোম্পানীতে প্রধান কর্মচারী হয়েছিলো। তার চুলগুলো সব কটা, হাড়শক্ত বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, পাথুর চোখ দুটী ঔদাসিন্যে ভরা। জার্মাণ ভাষা তার খুব বেশীরকম জানা আর বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিলো তার বিস্তর। নিজেদের অতীত জীবন সম্বন্ধে খোলসা ক'রে বেশী কিছু বলতে আমাদের মত অবস্থার লোকে বিরক্তি বোধ করে, তার পেছনে সময় সময় অবশ্য ন্যায়সঙ্গত কারণও থাকে। কাজেই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রেই নিলাম, বাইরে অন্ততঃ সেটুকুর অভাব নজরে পড়বার যো ছিলনা।

দ্বিতীয় সঙ্গীটী নিজেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ব'লে পরিচয় দিলে। আমি আর সৈনিকপুরুষটী দুজনেই একথায় বিশ্বাস করলাম। লোকটা যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, সব সময় সে তার পাতলা ফিন্‌ফিনে ঠোঁট দুটী চেপে থাকে; তাই তাকে খুব বেশী সন্দেহবাদী ব'লে মনে হয়। তা' সত্ত্বেও তার কথায় বিশ্বাস করবার হেতু আছে; সে ছাত্রই হোক্, গোয়েন্দাবিভাগের কোনো কর্মচারীই হোক্ আর চোর বাটপাড় যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। শুধু জানি, দৈবদুর্বিপাকে দুদ্দাড়া অবস্থায় যখন পরিচয় হয়েছে তখন আমরা তিনজনেই সমান। খিদের জ্বালা কারুর কম নয়, তিনজনের ওপরই পুলিশের কড়া নজর। আমাদের প্রত্যেককেই দুনিয়ার সবকিছুর ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে এটা যদি সে ভাবে তা' হ'লেই হয়।

আমার তরফ থেকে বলতে গেলে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে নিজের সম্বন্ধে সব সময় একটা বড় ধারণা পোষণ করবার বাতিক আমার ছিল।

সামনে সৈনিকপুরুষটী, পেছনে আমি আর আমার পেছনে সেই ছাত্রটী। ছাত্রটীর কাঁধ বেয়ে একটা কি ঝুলছিলো জ্যাকেটের মতন। তার তেরছা মাথায় ছিলো চওড়া একটা জরাজীর্ণ টুপি, মাথার চুল খুব ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। সরু সরু পা দুটো একটা আঁট-সাট পায়জামার মধ্যে ঢোকানো, জায়গায় জায়গায় তার রঙবেরঙের তালি আর পায়ের তলায় সে বেঁধে রেখেছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া উঁচু গোড়ালীওয়ালা একটা বুট জুতোর শুধু ওপরের দিকটা, জ্যাকেট থেকে ঢেঁড়া খানিকটা ফালি দিয়ে। সে বলে সেটাই তার 'স্যাণ্ডাল'।

কোনো কথা না বোলে চুপটী ক'রে সে হাঁটছিল রাস্তার ধুলো উড়িয়ে, স্বচ্ছ নীল চোখদুটো তার ঈষৎ মিটমিট করছিল।

আর সৈনিকপুরুষটীর গায়ে লালরঙের তুলোর সার্ট, খার্সন থেকে নিজহাতে সেটা সে জোগাড় করেছে, সার্টের ওপরে একটা বেশ গরম ওয়েষ্ট কোট, মাথায় বহু পুরোণো এক সৈনিকের টুপি, তার রঙ্ ঠিক করা যায়না; প'রে আছে একটা লম্বা পায়জামা, পা দুটো খালি।

আমারও পরণে এই রকম একটা পোষাক ছিল, তবে পায়ে দেবার আর কিছু জোটেনি।

আমাদের চারপাশে বিরাট তরঙ্গায়িত প্রান্তর তার অপূর্ব শোভা নিয়ে। তার ভেতর দিয়ে পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে, ধূলিকংকরময় বিপ্লসংকুল রৌদ্রোত্তপ্ত পথ। পা আমাদের পুড়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো সামনে পড়ে ফালি ফালি শস্যক্ষেত্র, সবেমাত্র সেখানে শস্য কাটা শেষ হয়েছে। সেগুলো দেখাচ্ছিল সৈনিকদের বহুকাল-না-কামানো গালের মতন।

পথ চলতে চলতে আনন্দের আবেগে সৈনিকবন্ধুটী গান ধরে। যেমন উগ্র কর্কশ তার গলা, তেমনি গম্ভীর সে গানের সুর। চাকরী করবার সময় সে সৈন্যদলের গীর্জায় সঙ্গীতাধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলো। আমাদের কথাবার্তা জুড়িয়ে এলে ফাঁকে ফাঁকে সে তখনকার শেখা গোটাকতক ধর্মসঙ্গীত গেয়ে সঙ্গীতবিজ্ঞানের বৃথাই অপচয় ক'রে চলত।

সামনে দিগন্তে নজরে পড়ল নক্সাকাটা রঙবেরঙের ছোট ছোট আকৃতি।

—ওগুলো নিশ্চয়ই ক্রিমিয়া পাহাড়ের চিহ্ন! শুষ্ক গলায় ছাত্রটী মন্তব্য করে।

—পাহাড়? অনেক দেরী, বন্ধু, অনেক দেরী। দেখ্‌চোনা, ওগুলো কেবল সারিসারি মেঘ। কেমন দেখাচ্ছে বলত?—ঠিক যেন দুধেমাখা ক্র্যান্‌বেরী (১) জেলির মতন। সৈনিকটী হাসতে থাকে।

মেঘগুলো বাস্তবিকপক্ষে জেলির তৈরী হ'লে কি মজা হোত তাই নিয়ে আমি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে খিদে যেন আরো বেড়ে গেলো প্রচণ্ডমাত্রায়, দুর্দিনের কি নিদারুণ অভিশাপ!

—কি আপদ, একটা জ্যান্ত লোকেরও যদি দেখা পেতাম! কিন্তু কেউ নেই এ সময়! সৈনিকটী থুথু ফেলে জোর গলায় চেঁচায়।

—কিন্তু আমি ত তোমায় বলেছি বেশ লোকজন আছে এমন একটা জায়গার খোঁজ করতে।—ছাত্রটী পরামর্শ দেয়।

—তুমি ত বলবেই, বিদ্যে বেশী তাই চুপ ক'রে ত আর থাকা যায়না! কিন্তু লোকের বসতি কোথায় তা' কোন্ শালা জানে?—সৈনিকের কণ্ঠে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

ছাত্র চেপে যায় ঠোঁট দুটী এক ক'রে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিআভায় দিগন্ত-ঘেরা মেঘের দল বিচিত্র রঙে রঙীন্ হ'য়ে ওঠে। মাটীর গন্ধ ভেসে আসতে থাকে বাতাসে ভর দিয়ে।

কিন্তু এই গন্ধে আমাদের খিদে যেন নতুন ক'রে চাড়া দিয়ে উঠল। মনে হোলো দেহের রস যেন মাংসপেশীর নালা বেয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে আর পেশীগুলো তত ক্ষীণ, নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে। সারা মুখে আর গলায় কেমন যেন ক্লেশকর নীরস ভাব, মাথা ঝিমিয়ে

(১) লালরঙের জম্বু ফল বিশেষ, খেতে টক্ লাগে।

আসছে আর চোখের সামনে যেন সর্বক্ষণ কালো কি একপ্রকারের দাগ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে ওগুলি বুঝি ধোঁয়াওঠা গরম মাংসের টুকরো, নয়ত পাঁউরুটী এবং আরও অন্য কিছু; কখনো বা তাদের বিশিষ্ট গন্ধগুলো পর্যন্ত শুঁকতে পাচ্ছি।

যাই হোক্ পরস্পরের কাছে ভাব বিনিময় ক'রে আর চারদিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলি; প্রাণে আশা জাগে হয়তো ভেড়ার পাল কোথাও চোখে পড়বে, নয়ত আর্মেনিয়ার বাজার অভিমুখী তাতার দেশের ফলবাহী গাড়ীগুলোর ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ ও বা শুনতে পাব।

কিন্তু উন্মুক্ত নির্জন প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে।

দুঃখধান্দার দিনে আজ সেই কোন্ সকালে তিনজনে মিলে আমরা খেয়েছি মাত্র চার পাউণ্ডটাক গমের রুটী আর পাঁচটা তরমুজ, তার ওপর হেঁটেছিও বড় কমখানি নয়, তাই পেরিকপের বাজারে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার পর যখন জাগলাম তখন খিদেয় আর চোখে দেখতে পাচ্ছিনা।

না শুয়ে না ঘুমিয়ে চুপটী ক'রে রাতটা ঠায় পাহারা দেবার পরামর্শ দিলে ছাত্রটী। কিন্তু ভদ্রসমাজে অপরের জিনিষ ছিনিয়ে নেবার মতলবের কথাটা জোর গলায় প্রচার করবার রেওয়াজ নেই, তাই এমনিতেই আমি বাক্‌রোধ ক'রেছিলাম। সত্যি কথা বলার ইচ্ছেটা আমার অসাধারণ, তাই বোলে অপ্রিয় সত্য আমার মুখ দিয়ে সহসা বেরোয়না। এটা আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আমি জানি এই সুসভ্যতার যুগে মানুষের অসৎ আচরণের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে ঠিক সেই ভাবে তার মনপ্রাণ কোমল থেকে কোমলতর হ'য়ে উঠছে। আমি ত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি লোকে যখন প্রতিবেশীর গলা টিপে ধরে তখনো তার মুখখানিতে দয়া বা সৌজন্যের অভাব ঘটেনা; এযুগ উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে অথচ জেলখানাই বল, মদের দোকানই বল, আর দুশ্চরিত্র লোকদের আড্ডাই বল, এদের সংখ্যা কমা ছেড়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

রাস্তা থেকে একটা ছোটখাটো কাঠের গুঁড়ি তুলে নিয়ে সৈনিকটী উৎসাহ দেয়: কমরেডস্, আগুন জ্বালাবার জোগার দেখা যাক্। আজ রাতটা এই মাঠের মাঝখানেই কাটাতে হবে ত, তার ওপর এই শিশির পড়চে।

দল ছাড়া হ'য়ে প্রত্যেকে রাস্তার আশেপাশে যা' কিছু পাওয়া যায় তারই খোঁজ করতে লাগলাম, গাছের লতাপাতা, শুকনো ঘাস, আরো অন্যকিছু, যাতে চট্ ক'রে আগুন লাগে এমন। যখনই মাথা নীচু করি তখনই মনে হয় মাটীতে শুয়ে পড়ি, নড়নচড়নরহিত হ'য়ে মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকি আর প'ড়ে প'ড়ে অঘোরে ঘুম দি'।

—যদি কোনো গাছের শেকড়বাকড়ও পাওয়া যেত! সৈনিকটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কালো চষা মাটীর ওপর শেকড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে পৃথিবীর বুকে

রাত নামল, দিন শেষের রাঙা রোদ মিলিয়ে যেতে না যেতে সুনীল অন্ধকার আকাশপথে ছোট ছোট তারা জ্বলে উঠল, আর আমাদের চারধারে নিকষ কালো ছায়া এলো ঘনিয়ে।

—কমরেডস্! ওই, ওইদিকে বাঁয়ে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, নয়?—চাপা গলায় ছাত্রটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—লোক! সন্দেহভরে সৈনিকটী প্রশ্ন করে: ওখানেই বা শুয়ে থাকতে যাবে কেন?

—বেশত, কাছে গিয়ে জিগ্যেস্ করোনা, ওর কাছে হয়তো রুটী মিলতে পারে—ছাত্রটী আমাদের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করে।

লোকটা যেদিকে শুয়েছিল সেদিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থুথু ফেলে দৃঢ় গলায় আবার সে হেঁকে ওঠে: চলো ওদিকে যাওয়া যাক্।

পঞ্চাশ সাঝিন্ (২) দূরের ঐ অন্ধকারে ঢাকা মানুষের দেহ কেবল তারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো। লাঙল চষার দাগের ওপর দিয়ে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তার দিকে যেতে লাগলাম, খাবার কিছু পাবার সম্ভাবনায় ক্ষুধাবোধ যেন আমাদের পেয়ে বসল। কাছে গিয়ে দেখি লোকটা নড়েওনা চড়েওনা, প্রাণের স্পন্দনও যেন থেমে গেছে।

—এ নিশ্চয়ই মানুষ নয়, অন্য কিছু—বিরস বদনে সৈনিকটী তিরস্কার করে।

আমাদের সন্দেহ দূর হোল তাকে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠতে দেখে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলাম লোকটা প্রকৃতই জ্যান্ত মানুষ, হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আছে।

তারপর অস্পষ্ট কাঁপা গলায় হাঁক দিল: কাছে এসোনা, তা হ'লে গুলি খাবে।

আকস্মিক তীব্র শব্দে বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে।

আমরা হতচকিত হ'য়ে থেমে যাই, তার এই অদ্ভুত কথার ভঙ্গীতে অভিভূত হ'য়ে থাকি।

—শালা বদমাস আছে। সৈনিকটী বিড়বিড় করে।

—যা বলেচো: ছাত্রটীকে চিন্তিত দেখা যায়: ওর হাতে একটা রিভলভারও আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওর মাথায় কিছু একটা মতলব আছে হে! সৈনিকটী চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা নির্বাক হ'য়ে আগের মতই প'ড়ে রইল।

—ওহে, শোনো ত। আমরা তোমায় কিছু বলতে চাইনা, কিছু রুটী ছাড়ো দেখি। দোহাই তোমার।—সৈনিকের কথা মাঝপথে আটকে যায়।

লোকটা তবুও নীরব হ'য়ে থাকে।

রাগে আর হতাশায় কাঁপতে কাঁপতে সৈনিক আবার বলে: শুনতে পাচ্ছোনা? আমাদের খানিকটা রুটী দেবার কথা বলছি। তোমায় কিছু বলবোনা, শুধু আমাদের দিকে ছুঁড়ে দাও।

(২) প্রায় সাড়ে তিনশো ফুটের সমান।

নীপার নদীর তীরে খার্সন সহরের একটা মদের দোকানে। একজন আগে কাজ করত রেলসৈন্যদলে পদাতিক সৈনিকের, পরে বোধ হয় ভিসচুলা রেল কোম্পানীতে প্রধান কর্মচারী হয়েছিলো। তার চুলগুলো সব কটা, হাড়শক্ত বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, পাণ্ডুর চোখ দুটী ঔদাসিন্যে ভরা। জার্মাণ ভাষা তার খুব বেশীরকম জানা আর বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিলো তার বিস্তর। নিজেদের অতীত জীবন সম্বন্ধে খোলসা ক'রে বেশী কিছু বলতে আমাদের মত অবস্থার লোকে বিরক্তি বোধ করে, তার পেছনে সময় সময় অবশ্য ন্যায়সঙ্গত কারণও থাকে। কাজেই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রেই নিলাম, বাইরে অন্ততঃ সেটুকুর অভাব নজরে পড়বার যো ছিলনা।

দ্বিতীয় সঙ্গীটী নিজেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ব'লে পরিচয় দিলে। আমি আর সৈনিকপুরুষটী দুজনেই একথায় বিশ্বাস করলাম। লোকটা যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, সব সময় সে তার পাতলা ফিন্‌ফিনে ঠোঁট দুটী চেপে থাকে; তাই তাকে খুব বেশী সন্দেহবাদী ব'লে মনে হয়। তা' সত্বেও তার কথায় বিশ্বাস করবার হেতু আছে; সে ছাত্রই হোক্, গোয়েন্দাবিভাগের কোনো কর্মচারীই হোক্ আর চোর বাটপাড় যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। শুধু জানি, দৈবদুর্বিপাকে ছন্নছাড়া অবস্থায় যখন পরিচয় হয়েছে তখন আমরা তিনজনেই সমান। খিদের জ্বালা কারুর কম নয়, তিনজনের ওপরই পুলিশের কড়া নজর। আমাদের প্রত্যেককেই দুনিয়ার সবকিছুর ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে এটা যদি সে ভাবে তা' হ'লেই হয়।

আমার তরফ থেকে বলতে গেলে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে নিজের সম্বন্ধে সব সময় একটা বড় ধারণা পোষণ করবার বাতিক আমার ছিল।

সামনে সৈনিকপুরুষটী, পেছনে আমি আর আমার পেছনে সেই ছাত্রটী। ছাত্রটীর কাঁধ বেয়ে একটা কি ঝুলছিলো জ্যাকেটের মতন। তার তেরছা মাথায় ছিলো চওড়া একটা জরাজীর্ণ টুপি, মাথার চুল খুব ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। সরু সরু পা দুটো একটা আঁট-সাট পায়জামার মধ্যে ঢোকানো, জায়গায় জায়গায় তার রঙবেরঙের তালি আর পায়ের তলায় সে বেঁধে রেখেছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া উঁচু গোড়ালীওয়ালা একটা বুট জুতোর শুধু ওপরের দিকটা, জ্যাকেট থেকে ছেঁড়া খানিকটা ফালি দিয়ে। সে বলে সেটাই তার 'স্যাণ্ডাল'।

কোনো কথা না বোলে চুপটী ক'রে সে হাঁটছিল রাস্তার ধুলো উড়িয়ে, স্বচ্ছ নীল চোখদুটো তার ঈষৎ মিটমিট করছিল।

আর সৈনিকপুরুষটীর গায়ে লালরঙের তুলোর সার্ট, খার্সন থেকে নিজহাতে সেটা সে জোগাড় করেছে, সার্টের ওপরে একটা বেশ গরম ওয়েষ্ট কোট, মাথায় বহু পুরোণো এক সৈনিকের টুপি, তার রঙ্ ঠিক করা যায়না; প'রে আছে একটা লম্বা পায়জামা, পা দুটো খালি।

আমারও পরণে এই রকম একটা পোষাক ছিল, তবে পায়ে দেবার আর কিছু জোটেনি।

আমাদের চারপাশে বিরাট তরঙ্গায়িত প্রান্তর তার অপূর্ব শোভা নিয়ে। তার ভেতর দিয়ে পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে, ধূলিকংকরময় বিষ্ণুসংকুল রৌদ্রোত্তপ্ত পথ। পা আমাদের পুড়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো সামনে পড়ে ফালি ফালি শস্যক্ষেত্র, সবেমাত্র সেখানে শস্য কাটা শেষ হয়েছে। সেগুলো দেখাচ্ছিল সৈনিকদের বহুকাল-না-কামানো গালের মতন।

পথ চলতে চলতে আনন্দের আবেগে সৈনিকবন্ধুটী গান ধরে। যেমন উগ্র কর্কশ তার গলা, তেমনি গম্ভীর সে গানের সুর। চাকরী করবার সময় সে সৈন্যদলের গীর্জায় সঙ্গীতাধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলো। আমাদের কথাবার্তা জুড়িয়ে এলে ফাঁকে ফাঁকে সে তখনকার শেখা গোটাকতক ধর্মসঙ্গীত গেয়ে সঙ্গীতবিজ্ঞানের বৃথাই অপচয় ক'রে চলত।

সামনে দিগন্তে নজরে পড়ল নক্সাকাটা রঙবেরঙের ছোট ছোট আকৃতি।

—ওগুলো নিশ্চয়ই ক্রিমিয়া পাহাড়ের চিহ্ন! শুষ্ক গলায় ছাত্রটী মন্তব্য করে।

—পাহাড়? অনেক দেরী, বন্ধু, অনেক দেরী। দেখ্‌চোনা, ওগুলো কেবল সারিসারি মেঘ। কেমন দেখাচ্ছে বলত?—ঠিক যেন দুধেমাখা ক্র্যান্‌বেরী (১) জেলির মতন। সৈনিকটী হাসতে থাকে।

মেঘগুলো বাস্তবিকপক্ষে জেলির তৈরী হ'লে কি মজা হোত তাই নিয়ে আমি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে খিদে যেন আরো বেড়ে গেলো প্রচণ্ডমাত্রায়, দুর্দিনের কি নিদারুণ অভিশাপ!

—কি আপদ, একটা জ্যান্ত লোকেরও যদি দেখা পেতাম! কিন্তু কেউ নেই এ সময়! সৈনিকটী থুথু ফেলে জোর গলায় চেঁচায়।

—কিন্তু আমি ত তোমায় বলেছি বেশ লোকজন আছে এমন একটা জায়গার খোঁজ করতে।—ছাত্রটী পরামর্শ দেয়।

—তুমি ত বলবেই, বিদ্যে বেশী তাই চুপ ক'রে ত আর থাকা যায়না! কিন্তু লোকের বসতি কোথায় তা' কোন্ শালা জানে?—সৈনিকের কণ্ঠে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

ছাত্র চেপে যায় ঠোঁট দুটী এক ক'রে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিআভায় দিগন্ত-ঘেরা মেঘের দল বিচিত্র রঙে রঙীন্ হ'য়ে ওঠে। মাটীর গন্ধ ভেসে আসতে থাকে বাতাসে ভর দিয়ে।

কিন্তু এই গন্ধে আমাদের খিদে যেন নতুন ক'রে চাড়া দিয়ে উঠল। মনে হোলো দেহের রস যেন মাংসপেশীর নালা বেয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে আর পেশীগুলো তত ক্ষীণ, নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে। সারা মুখে আর গলায় কেমন যেন ক্লেশকর নীরস ভাব, মাথা ঝিমিয়ে

(১) লালরঙের জম্বু ফল বিশেষ, খেতে টক্ লাগে।

আসছে আর চোখের সামনে যেন সর্বক্ষণ কালো কি একপ্রকারের দাগ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে ওগুলি বুঝি ধোঁয়াওঠা গরম মাংসের টুকরো, নয়ত পাঁউরুটী এবং আরও অন্য কিছু; কখনো বা তাদের বিশিষ্ট গন্ধগুলো পর্যন্ত শুঁকতে পাচ্ছি।

যাই হোক্ পরস্পরের কাছে ভাব বিনিময় ক'রে আর চারদিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলি; প্রাণে আশা জাগে হয়তো ভেড়ার পাল কোথাও চোখে পড়বে, নয়ত আর্মেনিয়ার বাজার অভিমুখী তাতার দেশের ফলবাহী গাড়ীগুলোর ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ ও বা শুনতে পাব।

কিন্তু উন্মুক্ত নির্জন প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে।

দুঃখধান্দার দিনে আজ সেই কোন্ সকালে তিনজনে মিলে আমরা খেয়েছি মাত্র চার পাউণ্ডটাক গমের রুটী আর পাঁচটা তরমুজ, তার ওপর হেঁটেছিও বড় কমখানি নয়, তাই পেরিকপের বাজারে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার পর যখন জাগলাম তখন খিদেয় আর চোখে দেখতে পাচ্ছিনা।

না শুয়ে বা ঘুমিয়ে চুপটী ক'রে রাতটা ঠায় পাহারা দেবার পরামর্শ দিলে ছাত্রটী। কিন্তু ভদ্রসমাজে অপরের জিনিষ ছিনিয়ে নেবার মতলবের কথাটা জোর গলায় প্রচার করবার রেওয়াজ নেই, তাই এমনিতেই আমি বাক্‌রোধ ক'রেছিলাম। সত্যি কথা বলার ইচ্ছেটা আমার অনাধারণ, তাই বোলে অপ্রিয় সত্য আমার মুখ দিয়ে সহসা বেরোয়না। এটা আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আমি জানি এই সুসভ্যতার যুগে মানুষের অসৎ আচরণের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে ঠিক সেই ভাবে তার মনপ্রাণ কোমল থেকে কোমলতর হ'য়ে উঠছে। আমি ত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি লোকে যখন প্রতিবেশীর গলা টিপে ধরে তখনো তার মুখখানিতে দয়া বা সৌজন্যের অভাব ঘটেনা; এযুগ উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে অথচ জেলখানাই বল, মদের দোকানই বল, আর দুশ্চরিত্র লোকদের আড্ডাই বল, এদের সংখ্যা কমা ছেড়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

রাস্তা থেকে একটা ছোটখাটো কাঠের গুঁড়ি তুলে নিয়ে সৈনিকটী উৎসাহ দেয়: কমরেডস্, আগুন জ্বালাবার জোগার দেখা যাক্। আজ রাতটা এই মাঠের মাঝখানেই কাটাতে হবে ত, তার ওপর এই শিশির পড়চে।

দল ছাড়া হ'য়ে প্রত্যেকে রাস্তার আশেপাশে যা' কিছু পাওয়া যায় তারই খোঁজ করতে লাগলাম, গাছের লতাপাতা, শুকনো ঘাস, আরো অন্যকিছু, যাতে চট্ ক'রে আগুন লাগে এমন। যখনই মাথা নীচু করি তখনই মনে হয় মাটীতে শুয়ে পড়ি, নড়নচড়নরহিত হ'য়ে মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকি আর প'ড়ে প'ড়ে অঘোরে ঘুম দি'।

—যদি কোনো গাছের শেকড়বাকড়ও পাওয়া যেত! সৈনিকটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কালো চষা মাটীর ওপর শেকড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে পৃথিবীর বুকে

Numbering Error

রাত নামল, দিন শেষের রাঙা রোদ মিলিয়ে যেতে না যেতে সুনীল অন্ধকার আকাশপথে ছোট ছোট তারা জ্বলে উঠল, আর আমাদের চারধারে নিকষ কালো ছায়া এলো ঘনিয়ে।

—কমরেডস্! ওই, ওইদিকে বাঁয়ে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, নয়?—চাপা গলায় ছাত্রটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—লোক! সন্দেহভরে সৈনিকটী প্রশ্ন করে: ওখানেই বা শুয়ে থাকতে যাবে কেন?

—বেশত, কাছে গিয়ে জিগ্যেস্ করোনা, ওর কাছে হয়তো রুটী মিলতে পারে—ছাত্রটী আমাদের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করে।

লোকটা যেদিকে শুয়েছিল সেদিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থুথু ফেলে দৃঢ় গলায় আবার সে হেঁকে ওঠে: চলো ওদিকে যাওয়া যাক্।

পঞ্চাশ সাঝিন্ (২) দূরের ঐ অন্ধকারে ঢাকা মানুষের দেহ কেবল তারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো। লাঙল চষার দাগের ওপর দিয়ে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তার দিকে যেতে লাগলাম, খাবার কিছু পাবার সম্ভাবনায় ক্ষুধাবোধ যেন আমাদের পেয়ে বসল। কাছে গিয়ে দেখি লোকটা নড়েওনা চড়েওনা, প্রাণের স্পন্দনও যেন থেমে গেছে।

—এ নিশ্চয়ই মানুষ নয়, অন্য কিছু—বিরস বদনে সৈনিকটী তিরস্কার করে।

আমাদের সন্দেহ দূর হোল তাকে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠতে দেখে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলাম লোকটা প্রকৃতই জ্যান্ত মানুষ, হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আছে।

তারপর অস্পষ্ট কাঁপা গলায় হাঁক দিল: কাছে এসোনা, তা হ'লে গুলি খাবে।

আকস্মিক তীব্র শব্দে বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে।

আমরা হতচকিত হ'য়ে থেমে যাই, তার এই অদ্ভুত কথার ভঙ্গীতে অভিভূত হ'য়ে থাকি।

—শালা বদমাস আছে। সৈনিকটী বিড়বিড় করে।

—যা বলেচো: ছাত্রটীকে চিন্তিত দেখা যায়: ওর হাতে একটা রিভলভারও আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওর মাথায় কিছু একটা মতলব আছে হে! সৈনিকটী চেঁচিয়ে ওঠে!

লোকটা নির্বাক হ'য়ে আগের মতই প'ড়ে রইল।

—ওহে, শোনো ত। আমরা তোমায় কিছু বলতে চাইনা, কিছু রুটী ছাড়ো দেখি। দোহাই তোমার।—সৈনিকের কথা মাঝপথে আটকে যায়।

লোকটা তবুও নীরব হ'য়ে থাকে।

রাগে অধর হতাশায় কাঁপতে কাঁপতে সৈনিক আবার বলে: শুনতে পাচ্ছোনা? আমাদের খানিকটা রুটী দেবার কথা বলছি। তোমায় কিছু বলবোনা, শুধু আমাদের দিকে ছুঁড়ে দাও।

(২) প্রায় সাড়ে তিনশো ফুটের সমান।

—চলো বেরিয়ে পড়া যাক্।

তার মুখ গম্ভীর, বিচলিত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম! প্রভাত সূর্যের ব্যাপ্ত সমারোহে ইতিমধ্যেই ছুতোরমিস্ত্রীর স্থির পাংশু মুখ খানি রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তার মুখ হাঁ করা, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসে অদ্ভুত জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; দেখলে ভয়ে গায় কাঁটা দেয়। পরণের যা' কিছু সব ছেঁড়া আর সে প'ড়ে রয়েছে মুষড়ে। ছাত্রটিরও কোনো হদিশ নেই।

হাতদুটো ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে লাকুতিন জেদাজেদি করে: হয়েচে তো, আর কেন? এবার চলো।

সকাল বেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করি: লোকটা কি মারা গেছে?

—তা' আবার জিগ্যেস্ করতে হয়? কশে গলা টিপে ধরলে কেউ কি বেঁচে থাকে নাকি!

—কিন্তু ধরলে কে, ঐ ছোকরা বোধ হয়?

—তাছাড়া আর কে? দেখচো ত শিক্ষার কি গুণ! বেশ চালাকি ক'রে লোকটাকে সাবড়ে রেখে এখন আমাদের ফলভোগ করতে ফেলে গেছে। আগে জানতে পারলে একটি ঘুষিতে ওর জান নিয়ে নিতাম। এখন চলো মানে মানে পালাই যাতে কেউ এই প্রান্তরে আমাদের দেখতে না পায়। আজকেই ওকে এ অবস্থায় সকলে দেখতে পাবে আর খুনীকে খুঁজতেও বাকী রাখবেনা। তার ওপর ওই সব প্রশ্ন,—'কোত্থেকে আসছো', 'কোথায় রাত কাটিয়েছো' আর আমাদের ধরলে ত কথাই নেই।

—তার ওপর তোমার কাছে ওর রিভলভারটা রয়েছে। ওটা ফেলে দাওনা কেন।

ভাবতে ভাবতে সে বলে: ফেলে দোব? তুমি জানোনা এর দাম কত! তিন তিনটে রুবল এর দাম, তার ওপর এর ভেতর একটা গুলি পোরা আছে। আর ও শালা কত কি নিয়ে ভেগেছে তা'ই বা কে জানে?

—ওর মেয়ে দুটোর বরাতে ঐ পর্যন্ত!

—মেয়ে? হ্যাঁ, তারা বড় হবে, যৌবনের কোঠায় পা দেবে কিন্তু আমাদের তারা বিয়ে করবেনা কক্ষনো এটা নিশ্চয় জেনো। যাক্‌গে। চলো তাড়াতাড়ি আর দেরী নয়। কোন্ দিকে যাবে বলোতো?

—যেদিকে ইচ্ছে চলো। ও একই কথা।

—তা ঠিক, তবু চলো ডান দিক দিয়ে যাওয়া যাক্, ওইদিকে বোধহয় সমুদ্র পড়বে।

খানিকদূর গিয়ে আমি পেছন ফিরে তাকালাম। বহুদূরে প্রান্তরের ওপর কালো একটা ঢিবি, তার ওপরে সূর্যের আলো এসে জড়ো হয়েছে।

—কি দেখচো ও উঠল কিনা! ভয় নেই ও আর উঠে তোমায় তাড়া করতে আসবেনা। তোমার ও পণ্ডিতটী সেদিকে ভালো, ওকে একেবারে পুঁতে রেখে গেছে। আশ্চর্য!

নিশ্চল বিজন আলোঝলমল প্রান্তর প'ড়ে রয়েছে চারিদিকে হাত পা মেলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় এই আলোর রাজ্যে হীন কায সংঘটিত হওয়া যেন অসম্ভব।

আধখানা সিগারেট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সঙ্গী বলে আজ আর খাওয়ার বাদবিচার নেই, কিছু পেলেই হল।

—কিন্তু আজ কি খাব, পাবই বা কোত্থেকে কেমন ক'রে?.....

প্রান্তর তোলপাড় হ'য়ে ওঠে এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনিতে।*

ম্যাস কন্‌ট্যাক্ট

"কাফের"

এলাহাবাদ—মতিলালের এলাহাবাদ, জওহরলালের এলাহাবাদ। এলাহাবাদে 'আনন্দ-ভবন', এলাহাবাদে এ. আই. সি. সির দপ্তর! শৈশব হইতেই এলাহাবাদ আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এলাহাবাদের কথা মনে পড়িলেই কল্পনায় ভাসিয়া ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রগামীদলের সৈনিকের দৃঢ় মুখচ্ছবি।

কয়েক বৎসর পূর্বে কি একটা মেলা উপলক্ষ্যে মনে নাই এলাহাবাদ দর্শনের সুযোগ মিলিয়াছিল। সহর পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলাম প্রত্যুষে, স্বরাজ ভবনের দ্বারে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। দ্বারে দ্বারবান নাই। মেলা প্রত্যাগত একদল গ্রাম্য নর-নারী গেটের সমুখে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় ইহারা মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটিয়া দূর দূরান্ত হইতে সহরে আসিয়াছে। মাথা মুড়াইয়া, সঙ্গমে স্নান করিয়া পুণ্যার্জন করিয়াছে, গ্রামে ফিরিবার পূর্বে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবকয়টাই দেখিবে। 'স্বরাজ-ভবন', কংগ্রেসের 'বড়াদপ্তর'ও দেখিবে। নহিলে কোন মুখ লইয়া গ্রামে ফিরিবে? দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ইহাদের আলোচনার কথার টুকরাগুলি কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

[* Goky র 'In the steppes' গল্পের অনুবাদ]

ইতিমধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল। বারণ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং একে একে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। আমিও ইহাদের সহিত কিছুটা ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসিয়া দেখি উহারা দল বাঁধিয়া একটা লনের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। কি যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিতেছে মুখের ভাব এইরূপ। আগাইয়া আসিয়া দেখিলাম একটি বিলাতী আয়া গুটি কয়েক দেশী শিশুকে লইয়া খেলা করিতেছে। দৃশ্যটি আমিও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

সরু কাঁকরের পথ। আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে। চলিতে চলিতে আমরা এ. আই. সি. সির 'দপ্তরে'র সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সমুখে কয়েক ধাপ সিড়ি। তাহার পর বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভদ্রলোক ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। ইহার পর হল ঘর। ঘরের মধ্যেকার টাইপ রাইটারের খটাখট শব্দ বাহিরে ভাসিয়া আসিতেছে। উপরে জাতীয় পতাকা, হাওয়ায় পৎ পৎ করিয়া উড়িতেছে।

বারান্দায় ওঠা সমীচীন হইবে কিনা উহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর সাহস করিয়া একে একে সকলেই বারান্দায় উঠিল। পাঠরত ভদ্রলোকেরা বাধ্য হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন একমুখ বিরক্তি লইয়া। বারান্দা হইতে হল ঘরের মধ্যে টাঙ্গানো কয়েকজন দেশনেতার ছবি চোখে পড়ে। কয়েকটী আলমারী আর কয়েকজন কর্মরত কেরাণী। হলের মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, উঁকি দিয়া যতটা পারে দেখিয়া লইবার চেষ্টা সকলের মধ্যেই প্রবল।

গ্রামে থাকিতে ইহাদের ধারণা জন্মিয়াছে কংগ্রেস অফিস তীর্থস্থান। নেতাদের বহু বক্তৃতা ইহারা শুনিয়াছে। কংগ্রেস কিষাণ মজুরের 'হামী'। কংগ্রেসরাজ কায়েম হইলে কিষাণ মজুরের দুঃখ কষ্ট দূর হইবে। জওরলাল, আনন্দ-ভবন, আরোও কত কি ইহারা শুনিয়াছে। মনে জাগিয়াছে কংগ্রেসের প্রতি দরদ। সেই কংগ্রেস অফিসের এত সন্নিকটে আসিয়া দ্বার হইতেই ফিরিয়া যাইতে মন সরিতেছে না।

"এই চলো, ভীড় মৎ করো, যাও ইধারসে"। হল ঘরের মধ্য হইতে কোন এক দেশ সেবকের তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলির আশাদীপ্ত মুখগুলির উপর নামিয়া আসিল হতাশার ছায়া। একে একে সকলেই নীচে নামিল। আমিও।

এ. আই. সি. সির দপ্তর দেখা আর হইয়া উঠিল না।

ফিরিবার পথে কল্পনায় এলাহাবাদের পূর্ব ছবিটিকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিলাম। এলাহাবাদ আসিল না, শুনিতে পাইলাম "এই চলো, ভীড় মৎ করো, যাও ইধারসে।"

—o—

মৃত্যুহীন

আর্যকুমার সেন

তিন মাস আগের কথা।

পাশের বাড়ির হরিশবাবু আসিয়া বলিলেন, "পরশু আমার বাড়িতে আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন।"

অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি দক্ষিন হস্তের তর্জনীকা বাহির করিয়া দেখাইলেন। একটি কুশের আঙটি।

বলিলাম, "বিয়ে করেছেন? কবে?"

"পরশু।"

"তা এমন নিঃশব্দে সারলেন কেন?"

নিঃশব্দে সারার কারণ সোরগোল করিবার কিছু ছিল না বলিয়া। হরিশবাবুর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স, বিপত্নীক। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বাসনা তাঁহার কোনোদিন ছিল না। শুধু এক অনাথা বিধবার দায় উদ্ধার করিয়াছেন। খুব যে অনিচ্ছার সঙ্গে, তাহা নহে। বধূ সুন্দরী।

একটি ছোটখাট রাস্তার উপরে একখানি পুরানো বাড়ি ভাড়া লইয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া মেসবাসী হইয়াছি। হরিশবাবুই প্রথম যাচিয়া আলাপ করেন। বলিয়াছিলেন, "একা মানুষ পড়ে থাকি, তিনকুলে ত কেউ নেই! অন্ততঃ গোটাকয়েক কাঁধ দেওয়ার লোক ত দরকার!"

তিনি নাকি অশুভ আশঙ্কাতেই আমাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আজ দেখিয়া খুশি হইলাম সে পরিচয়ের প্রথম অঙ্ক শুভ কর্ম্মে ভূরিভোজনে। সানন্দে আমন্ত্রন গ্রহণ করিলাম।

বধূর বয়স ষোলসতেরোর বেশী নহে। সেদিক দিয়া হরিশবাবুর সঙ্গে একটু বেমানান। তা হোক, অনাথা বিধবার মেয়ে স্বচ্ছল ঘরে আশ্রয় পাইয়াছে, সেটাই বড় কথা।

তিন মাস পরের কথা।

শনিবার বিকালের দিকে একটু সিনেমায় যাইব ভাবিতেছি, দ্বারদেশে হরিশবাবু দেখা দিলেন। চুল উস্কোখুস্কো, কোটরগত চক্ষু।

শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে হরিশবাবু? অসুখবিসুখ করেনি ত?

হরিশবাবু সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "শ্মশানে যেতে পারবেন?"

চমকিয়া কহিলাম, "সে কি?"

হরিশবাবু বলিলেন, "সুকুমারী মারা গেছে খানিক আগে।"

স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

কয়েকদিন আগে সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সুকুমারী চাপিয়া যায়। ফলে জ্বরের অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধি, এবং তাহার পরে আজকের ঘটনা।

সুকুমারী পালঙ্কে শুইয়া আছে। সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, যে এ সুকুমারী সে নহে, যাহার শুভ আগমন উপলক্ষ্যে আমরা তিন মাস আগে এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলাম। অথচ সে সুকুমারী ছিল রক্তমাংস দিয়া গঠিত মানুষ, আজকের সুকুমারী মৃতদেহ মাত্র। যে মুখে চকিত হাসি অশ্রু ফুটিয়াছে শরৎকালের মেঘ ও রৌদ্রের মত, সে মুখে হাসি এখনও লাগিয়া আছে, শুধু তাহাতে প্রাণ নাই। সুকুমারী পৃথিবীর তুচ্ছ হাসি কান্না মান অভিমানের অনেক উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, হরিশবাবু কহিলেন, "একবার রাজারের দিকে যান, একখানা খাটিয়া নিয়ে আসুন।"

একজন খাটিয়া আনিতে চলিয়া গেল।

এই ঘরেই সুকুমারীকে নববধূরূপে দেখিয়াছিলাম। পরণে লাল বেনারসী শাড়ী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। রূপ যেন দেহে ধরিতেছিল না। সে রূপের অনেকখানি অংশ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকিবে না।

যে সিঁড়ি দিয়া নববধূ সুকুমারী লাল চেলি পরিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেই সিঁড়ি দিয়াই তিন চার জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিলাম।

শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "বল হরি—।" বাকী কথাগুলি আর কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। নিঃশব্দে শব বহিয়া চলিলাম। হরিশবাবু সঙ্গে চলিলেন। ক্রন্দনরত কেহ পিছনে পড়িয়া রহিল না, কারণ আর কেহ কাঁদিবার লোক নাই।

আশ্চর্য! যাহাকে কোনদিন চিনিলাম না, শুধু একদিন মাত্র যাহাকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম, তাহারই শব দেহ বহন করিবার ভার পড়িল আমাদের উপর! জীবনে আমাদের উপরে যাহার কোনো অধিকার ছিল না, মৃত্যুর পরে এ অধিকার তাহার কোথা হইতে আসিল!

যাহাকে লইয়া প্রশ্ন তাহার নিকট হইতে আর এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর অনেক সমস্যার মত এ সমস্যাও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

শ্মশানে একসঙ্গে পাঁচটি চিতা জ্বলিতেছে। প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া মানুষ, যে সারাজীবনের দেনাপাওনার খেলা শেষ করিয়া চিতাগ্নির নীচে শেষ আশ্রয় পাইয়াছে। প্রাচীর বেষ্টিত সমস্ত শ্মশান আগুণের রঙে লাল।

মন্ত্র পড়িয়া সুকুমারীর মুখাগ্নি হইয়া গেল।

বাহিরে আদি গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিলাম।

ঘাটের উপরে শানবাঁধান খানিকটা স্থান, উপরে ছাদ। মেঝের উপরে কয়েকটা লোক নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে।

একটা স্ত্রীলোক, সন্ন্যাসিনীও হইতে পারে, পাগলী হওয়াও আশ্চর্য নয়, আপন মনে বিড়বিড় করিতে করিতে এক কোণায় আশ্রয় লইল। পরিধানে ময়লা একটা গেরুয়ারঙের আবরণ মাথায় জটা। একটা ছিন্ন অতি মলিন কাঁথা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সে ঘুমের আয়োজন করিতেছে। এক পাশে ছুটি লোক গায়ের চাদর মাটিতে বিছাইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, দেখিলে মনে হয় শ্মশানঘাটে রাত কাটানোতে তাহারা অনভ্যস্ত নহে।

একজন সন্ন্যাসী আসিয়া একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি মাথার নীচে দিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। লোক ছুটি ভ্রুক্ষেপও করিল না।

সহসা সন্ন্যাসীর বিকট চীৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। "ব্যোম, ব্যোম, হর হর শঙ্কর!" মনে পড়িল রাত্রি যত গভীরই হৌক, শ্মশানে যাহারা ঘুমাইতে আসে, এটুকু গোলমালে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, ইহার চেয়ে অনেক বেশী গোলমালেও না।

দেওয়ালের রঙ এককালে সাদাই ছিল। এখন তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কাঠকয়লার কলঙ্কের ছাপ। ছাদ পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

অজস্র নাম। গত ছুই তিন বৎসর ধরিয়া এ শ্মশানে যত লোকের শেষকৃত্য হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই নাম বোধহয় কাঠকয়লার সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় লইয়াছে। কাঠকয়লা কোথা হইতে আসিয়াছে সম্ভবতঃ না বলিলেও চলে।

জীবিত ব্যক্তির নাম যে নাই, তাহা নহে। এদিক ওদিক খুঁজিলে ছুই একটা নাম চোখে পড়ে যাহাদের আগে শ্রী শব্দটি রহিয়াছে। বাকী সবগুলির আগে একটি করিয়া চন্দ্রবিন্দু। ৺ভূমোহন রায়, ৺হরেন্দ্রনাথ বসু, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এমনি অনেক নাম, সংখ্যাহীন।

মনে মনে হাসিলাম। মানুষের অমরত্বের কি ছুর্নিবার স্পৃহা! যেখানে লোকের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত চিতার আগুনে মুছিয়া দিতে আসিয়াছে, যেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে মৃত্যুই একমাত্র সত্য, জীবন চরম মিথ্যা, সেইখানেই মানুষ অমরত্বের আশা করিয়াছে। নাম লিখিয়াছে কাহার? যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের? না। যাহারা এ জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের জন্য চুকাইয়াছে, সারাজীবন মৃত্যুর সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া পরাজিত হইয়াছে, তাহাদের নাম।

অন্যমনস্কভাবে শুনিলাম সন্ন্যাসীও সেই কথাবলিতেছে। নিদ্রালু লোক ছুটি সহসা তাহাকে পরম দার্শনিক সাধু ঠাওরাইয়া শ্রদ্ধাভরে তাহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে, এবং মন দিয়া তাহার উত্তর শুনিতেছে।

সন্ন্যাসীর ভাষা হিন্দী ও বাংলা মিশ্রিত। পৃথিবীটা যে কিছুই নহে, মায়া প্রপঞ্চ, এই তাহার উপদেশের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু সে কথা জানিবার জন্য গঞ্জিকাসেবী মলিন গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর সাহায্যের কি প্রয়োজন বুঝিলাম না। শ্মশানের সম্মুখে বসিয়া যাহারা তিলে তিলে প্রিয়জনের দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিতেছে, তাহারা কি এ সত্য এত সহজে ভুলিয়া যাইবে? শ্মশান হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে?

সহসা কোণে শায়িত সন্ন্যাসিনী গোঙাইয়া উঠিল। লোক ছটির একজন বলিল, "কিরে পাগ্‌লী, মশায় কামড়াচ্ছে?"

পাগ্‌লী তেমনি ক্রন্দনজড়িত স্বরে উত্তর দিল, "আমি পাগল না।"

সন্ন্যাসী সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "সে আমি জানি।"

তাহার নবলব্ধ শিষ্যদ্বয় কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মুখব্যাদান করিয়াই রহিল।

পাগলী আপন মনেই বারকতক বলিল, "আমাকে খালি খালি পাগল পাগল করিস্‌নে, আমি পাগল না।"

কথাটা পাগল মাত্রেই সম্ভবতঃ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে; কাজেই কিছুমাত্র অবাক হইলাম না। কিন্তু সন্ন্যাসী শুইয়া শুইয়াই বলিল, "মা একটু চরণ সেবা ক'রে দেব?"

বুঝিলাম ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। পাগলী অনুনাসিক কণ্ঠে বলিল, "খবরদার, আমায় ছুঁসনে!"

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হুকুম না পেলে ছোঁব কেন মা?"

লোক ছুইটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত নিদ্রা। সশব্দে তাহাদের নাক ডাকিতেছে।

সন্ন্যাসী আপন মনেই খানিকটা উপদেশ দিল। কহিল, "অমর হতে চাও ত পৃথিবীর মোহ ত্যাগ কর—ইত্যাদি" অর্থহীন অনেকখানি প্রলাপ। নিদ্রিত লোকদুটির নাক ডাকা থামিল না।

আপন মনে বলিলাম, "অমর হতে চাও ত এই জায়গাটার দেওয়ালে বড় বড় করে নাম লেখো, ৺অমুক চন্দ্র তমুক।"

সন্ন্যাসী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসিনী ঘুমের মধ্যেই গোঙাইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সশব্দে চড় মারিয়া মশা মারিতেছে।

রাত অনেক হইয়াছে। গঙ্গার ওপারে চেৎলার একটি বাড়িতেও আলো জ্বলিতেছে না। সম্ভবতঃ দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে।

ঘাট ছাড়িয়া উঠিলাম। এতক্ষণে সুকুমারীর দেহের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে?

চিতা এখনও ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘাট হইতেই খানিকক্ষণ পরপর তিনবার হরিধ্বনি শুনিয়াছি। তিনটি নূতন শবদেহ আসিয়াছে। পুরাণের চিতার দুইটার কাজ শেষ হইয়াছে, সেখানে নূতন দেহের উপর নূতন করিয়া চিতা জ্বলিয়াছে। একটা দেহ তখনও পড়িয়া আছে, কাঠ আসিয়া পৌঁছায় নাই।

এক অতিবৃদ্ধার মৃতদেহ। অস্থির উপর চর্ম ভিন্ন আর কিছু নাই বলিলেও চলে, কিন্তু সধবা। সমস্ত কপালটা সিঁদুর দিয়া লেপা, দুই পায়ে আলতা।

যাহারা আনিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদেরই একজন, কালো রঙ, খালিগায়ের উপর গামছা জড়ানো, তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "দু ঘন্টাও লাগবে না, ওতে আছে কি ?"

যেন বাকি শবদেহগুলির মধ্যে কিছু আছে! যেন চিতা জ্বলিয়া শেষ হওয়ার পরে কোনোটিরই মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে!

যাত্রীশালার বারান্দায় সঙ্গীরা আর একটি পাগলী জোগাড় করিয়া আলাপ জুড়িয়াছে। সময় কাটানো দরকার। সুকুমারীর দেহ নিশ্চিহ্ন হইতে এখনও বেশ খানিকটা বাকী আছে।

পাগলী তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছে। যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিচিত্র। যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলেও বিচিত্র, কারণ গল্পের মধ্যে উদ্ভাবনাশক্তির প্রচুর পরিচয় আছে। সঙ্গীরা হাঁ করিয়া গল্প গিলিতেছেন।

পাগলীর বাপের বাড়ি এঁড়েদহ, শ্বশুরবাড়ি বরিশাল। সে সুন্দরী না হওয়ায় স্বামী তাহাকে ত্যাগ করেন, তখন সে নিজে উদ্যোগী হইয়া নিজের মামাতো বোনের সহিত স্বামীর বিবাহ দেয়।

একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি করেন ?" পাগলী উত্তর দিল, "সিভিল সার্জন। খুব ভালো ফোঁড়া কাটতে পারে।"

সিভিল সার্জন অর্থে যে ফোঁড়া কাটার ডাক্তার, তাহা জানা ছিল না। একজন বলিলেন, "কোথায় থাকেন তিনি ?"

পাগলী এতক্ষণ আপন মনে হাসিতেছিল। বলিল, "কে আবার কোথায় থাকেন ?"

"আপনার স্বামী, সেই সিভিল সার্জন ?"

পাগলী বিরক্ত হইয়া বলিল, "স্বামী আবার কোথায় দেখলে তোমরা ? একশবার বলছি মামাতো ভগ্নীপতি—"

"আচ্ছা তাই না হয় হল।"

"সে এলাহাবাদ থাকে।"

সহসা বলিলাম, "আপনার বাপের বাড়ি কোথায় ?"

"কাটোয়া।"

"আর শ্বশুর বাড়ি ?"

"বিক্রমপুর।"

এইবার সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এঁড়েদহ ও বরিশাল যথাক্রমে কাটোয়া ও বিক্রমপুরে পরিণত হইলে আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে।

পাগলী একেবারেই দমিল না। বলিল, "বিক্রমপুর হচ্ছে আমার আসল শ্বশুরবাড়ি—আর—"

একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আর বরিশাল হল নকল শ্বশুরবাড়ি—কেমন ?"

পাগলী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়া গেছে, একটা সোজা কথা বোঝে না।"

অগত্যা আলাপের ধারা পরিবর্তিত করিতে হইল। স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত ?"

পাগলী বলিল, "কেন ? এইখানেই! তাছাড়া কাশীমিত্তিরের ঘাট আছে, নিমতলা আছে—"

"রক্ষে করুন, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়। আমার মনে হচ্ছে আপনাকে বাঁচিতে দেখেছি—"

সকলে হাসিলাম। পাগলী বলিল, "খুবই সম্ভব। বাঁচির শ্মশানঘাটে আমি এক নাগাড়ে বারোবছর তপিস্যে করিছি।"

এমনি অসম্বন্ধ খানিকটা প্রলাপ। আমরা যে শ্মশানঘাটে বসিয়া আছি, সামনে একসঙ্গে ছ'টা চিতায় ছয়টি নর-নারীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতেছে, তাহা যেন কাহারও মনে নাই। হরিশবাবুরও না।

বাঁ দিকে পাঁচিলের পাশ ঘেঁসিয়া সুকুমারী। প্রজ্বলিত কাষ্ঠের ভিতর দিয়া পা দুইখানি দেখা যাইতেছে, খানিক আগে যে পা আলতা দিয়া রঞ্জিত করিয়া আনিয়াছিলাম। অবশিষ্ট আছে দুইখণ্ড অঙ্গার। খানিক পরে তাহাও থাকিবে না।

বাহিরে ঘাটের ধারে লোকগুলি বোধ হয় এতক্ষণে মশার কামড় উপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সামনে আরও কয়েকজন ঘুমাইতেছে, জাগরণহীন নিদ্রা। শুধু আমরা জনকয়েক শববাহক বসিয়া শ্মশান ঘাটের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি।

আরও অনেকক্ষণ পরে। কতক্ষণ পরে মনে নাই, কারণ এখানে সময়ের কোনো দাম নাই, অস্তিত্বও নাই। অনন্তকালের সহিত পাল্লা দিয়া মানুষের হাতে গড়া ঘড়ির সময় কতটুকু চলিবে।

চিতা নিভিয়া গিয়াছে।

তবু যেটুকু বাকী আছে, কলসে কলসে আদি গঙ্গা হইতে কর্দমাক্ত জল আনিয়া তাহাও নিভাইয়া দেওয়া হইল। হরিশবাবু বলিলেন, "এইবার এক কলসী জল এনে চিতার উপর ভেঙ্গে দিয়ে চলে যান; দেখবেন, কেউ যেন পিছন ফিরে দেখবেন না!"

কে পিছন ফিরিয়া দেখিবে? যাহার সহিত পরিচয় ছিল না কোনদিন, মৃত্যুর আবির্ভাবে শুধু একরাত্রির জন্য পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তাহার পরমাত্মীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, চিতা নির্বাপিত। নবলব্ধ পরিচিতার আর কোন চিহ্ন পৃথিবীর উপরে অবশিষ্ট নাই—দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে।

কে পিছন ফিরিয়া চাহিবে? কাহার জন্য পিছন ফিরিয়া চাহিবে? সুকুমারীর জন্য? সুকুমারী ত একরাত্রি আগে মৃত্যুময় জীবনের ক্ষণিক পান্থশালায় বিশ্রামের পর অসীম পথে, মৃত্যুহীন অমরত্বের পথে যাত্রা করিয়াছে!

শ্মশানঘাটের প্রাচীরে যাহাদের নাম লেখা আছে, তাহারাও ঐ একই পথের যাত্রী। শুধু কোন্ অতিপ্রিয় আত্মীয়, অথবা একান্ত অনাত্মীয় শ্মশানবন্ধু ক্ষণিকের দুর্বলতায় তাহাদের নাম অমর করিয়া রাখার প্রয়াস পাইয়াছে, মৃতচিতার অঙ্গার খণ্ডের সাহায্যে।

বাহিরে আসিয়াছি। সহসা কি মনে করিয়া সকলের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সঙ্গীরা অবাক হইয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চিতার উপরে কাঠকয়লার রাশি ও ছাইয়ের স্তূপ। তাহারই মধ্য হইতে একটুকরা কাঠকয়লা উঠাইয়া লইয়া বাহিরে গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলাম। অনেক কষ্টে একটুখানি সাদা জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লিখিলাম,

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

একটু ভাবিয়া "শ্রীমতী" কাটিয়া একটা চন্দ্রবিন্দু বসাইয়া দিলাম।

আর্থিক জগত

জিতেন্দ্র গোস্বামী

দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্স

কিছুকাল পূর্বে ভারত সরকারের প্রেস নোট প্রকাশিত হয়েছে তাহার তাৎপর্য এই "স্পেকুলেসন ও নানা কারণে বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব আর একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্স আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় না করেন কারণ অতিরিক্ত ক্রয়ে স্পেকুলেটারদের প্রভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়।" *

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গের সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতায় গবর্ণর স্যার জেম্‌স টেইলর সেদিন বলেছিলেন যে বিগত দ্বাদশমাসের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৯৩৯ সালের শরৎকালে যুদ্ধারম্ভের ত্রাস ও ডানকার্কের দুর্গতির অব্যবহিত পরবর্তী কালের স্বল্পকালস্থায়ী দ্রব্যমূল্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যাপক ও শঙ্কাজনক বিপর্যয়, কখনও ঘটেনি। যেটুকু ঊর্ধ্বগামিতা দেখা দিয়েছে তা সাধারণ এবং স্বাভাবিক বলে নিঃশঙ্কচিত্তে মেনে নেওয়া যেতে পারে। স্যার জেম্‌সের বক্তৃতার মাসখানেকের মধ্যেই দ্রব্য মূল্যের এমন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে যে জনসাধারণ তথা কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দ্রব্য মূল্যের আপেক্ষিক মান-নির্দেশক সংখ্যা বা "Price or Index number" এর সাহায্যে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাবে। কলিকাতার সাধারণ দ্রব্য মূল্যের মান ১৯৪০ সালের মে মাসে ছিল ১১৭, ১৯৪১ সালের মে মাসে তাহা বেড়ে ১২০ হয়েছিল; জুন মাসে তা ছিল ১২৮ এবং জুলাই মাসে বেড়ে হয়েছে ১৪৯। বোম্বাইয়ের অঙ্ক এখনও নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি তবে বিশেষজ্ঞদের মতে জুন মাসের ১২৭ থেকে জুলাই মাসে তা ১৪০এ উঠেছে। এই বৎসরের জানুয়ারীর তুলনায় কলিকাতার দ্রব্য মূল্যের সাধারণ মান ২৮ পয়েন্ট এবং বোম্বাইয়ের ২৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সঙ্গে এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কলিকাতায় দ্রব্য মূল্যের বর্তমান মান যুদ্ধাতঙ্কের (অর্থাৎ ১৯৩৯ নবেম্বর ডিসেম্বর) কাল থেকেও

---

* "There has recently been a visible tendency for the prices of various commodities including textiles, to rise sharply, partly due to speculative influences and partly to more substantial reasons. The Government of Indin are giving the closest attention to this object and propose to convene another Price Control Conference as early as possible. Meantime, the best service the public can render to themselves is to refrain from making purchases in excess of their normal requirements, as such purchases only serve to encourage those speculative influences which contribute to a rise in prices"—

১২ পয়েন্ট এবং প্রাক্‌যুদ্ধ কাল থেকে ৪৯ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্য হিসাবে ভাগ কর্লে দেখা যায় চাউল গম, ডুট্টা ইত্যাদির মূল্য বেড়েছে ৬ পয়েন্ট, ডাল ইত্যাদির ৯ পয়েন্ট, চিনির ৮ পয়েন্ট চায়ের ২২ পয়েন্ট। একথা বিশেষ লক্ষ করার ব্যাপার যে গত তিন মাসে চায়ের দামের বৃদ্ধি ঘটেছে ৬৫ পয়েন্ট এবং বস্ত্র ও বস্ত্রজাতের ৫৬ পয়েন্ট।

১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে সাধারণভাবে ক্রমবর্ধিত দ্রব্য মূল্যের কারণ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধের স্বাভাবিক ফল বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিগত দু'তিন মাসের আকস্মিক ও অভাবনীয় বৃদ্ধির পেছনে বিশ্বব্যাপী মহাসমর সংক্রান্ত বিপর্যয় ছাড়াও অধিকতর শক্তিশালী স্থানীয় ও সাময়িক কারণ বর্তমান এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। স্পেকুলেটর বা ফাটকাওয়ালা কারসাজি চাহিদা ও'যোগানের এই অসাম্যের সুযোগকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে দ্রব্য মূল্যের এই আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক গগনে কৃষ্ণমেঘের ঘনায়মান ছায়ার সুযোগ নিয়ে একদিনেই চিনির বাজার এতোখানি বেড়ে উঠেছিলো যে সিণ্ডিকেটের কর্তারা Quota র পরিমাণ বৃদ্ধি করে মূল্য বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মালবাহী জাহাজের অভাবে বর্মাথেকে প্রয়োজন মত আমদানি হতে পায়নি বলে চাউলের মূল্য আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই জাহাজী অব্যবস্থার অন্তরালে বর্মায় ফাটকাওয়ালার সুনিপুণ হস্ত কতখানি কাজ করেছে সে বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ। স্বাভাবিক কারণের সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সুকৌশলী প্রয়োগ বর্তমানে অর্থনীতিক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে ও করে চলেছে। ইহা স্বীকার কর্তেই হ'বে যে বাড়্‌তির বাজারে যোগান যখন চাহিদার সঙ্গে সমপদক্ষেপে চল্‌তে সক্ষম নয়, তখনই ফাটকাওয়ালার দ্রব্য মূল্যের যদৃচ্ছা ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটে। এতকাল প্রাদেশিক সরকারের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের সকল দায়িত্ব চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন কিন্তু কার্যতঃ প্রাদেশিক সরকার যে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্তে পারেননি ক্রমবর্ধিত দ্রব্য মূল্য তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের সর্বত্র যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হ'য়েছে তার পরিণাম দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার পরিপন্থী হ'য়ে উঠেছে; "Bread riot" গোছের সম্মিলিত অভিযান ও বলপ্রয়োগ পূর্বক লুটতরাজ ইতিমধ্যেই সংঘটিত হ'তে সুরু করেছে। ব্যাপক ও মারাত্মকভাবে কর্তৃপক্ষের শাসন শৃঙ্খলাকে অমান্য করার রূপ পরিগ্রহ করা শুধু সময়সাপেক্ষ। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবিলম্বে অবহিত না হোলে, এই ব্যাপারে দীর্ঘকাল হরণ করার মধ্যে শুধু যে দুর্গতিকে অনাবশ্যক বাড়িয়ে দেওয়া এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থ শোষণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার মেনে নেওয়া হচ্ছে তাই নয়, ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে বাজারের অবস্থা কার্যকরী নিয়ন্ত্রনের গণ্ডীর বাইরে চলে যাচ্ছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

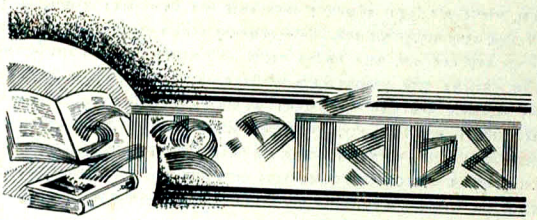

দৃষ্টিকোণ—শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। "কবিতা ভবন" ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, প্রাপ্তিস্থান—ডি-এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ১৷৷০ পৃঃ ১৬০।

বাংলা ভাষায় গল্প রচনার বাহুল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত গল্পের পরিমাণ এখনো যথেষ্ট কম। আদি থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত যা আমাদের গল্প রচনা, তা হচ্ছে প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ প্রসঙ্গাত্মক—তার লক্ষ্য হ'ল সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, আচার, অনুষ্ঠান আরো অনেক কিছু নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা। কাজেই সাম্প্রতিক সমাদরের মাশুল আদায় করেই তা প্রবহমান সাহিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, দেবেন্দ্র নাথ, টেকচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, সকলেরই মূল্য আজ যতটা ঐতিহাসিক, ততটা সাহিত্যিক নয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গল্পকে সাহিত্যিক কৌলীন্যে অভিসিক্ত কর্‌লেন—কিন্তু তখনো পর্যন্ত তার শিক্ষক রূপটাই রইলো বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে।

বলা অনাবশ্যক যে এর প্রয়োজন ছিল। বাংলা গল্পই মোটের ওপর একালের সৃষ্টি—তার কোন কৌলিক গরিমা নেই। শ্রীরামপুরের পাদ্রী পণ্ডিতদের হাতে ধর্মপ্রচারের বাহনরূপে যার জন্ম, এঁরা তাকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিচার-বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধিশালী করে না তুললে, তার শব্দভাণ্ডার ও প্রকাশভঙ্গী নানা বিচিত্র পথে প্রবাহিত করার উপযোগী করে ন' তুললে, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিশেষ বেগ পেতে হত। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন প্রায় তৈরি একটা ভাষা—যাতে একই সঙ্গে ছিল বস্তুর সঞ্চয় ও ভঙ্গীর সাবলীলতা। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর সৃজনী প্রতিভা প্রয়োগ করে অতি অনায়াসেই তাকে ঐশ্বর্য মণ্ডিত করে ফেললেন। এখন থেকে যা আমাদের গল্প, তার একটা মাপকাঠি নির্ণয় সম্ভব—কারণ অতি সাধারণ লেখকের রচনাও এর পর একটা বিশেষ স্তরের নীচে নামে না।

এর কারণটা সহজ। রবীন্দ্রনাথ এমন একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন, সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন এমন একটা সহজ নমনীয় বিন্যাসপদ্ধতি, যাতে গল্পরচনা অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলো। জাতি গঠন, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার যে কোন দিকেই তাকে নিয়োজিত করা হক, তা প্রথমতঃ হতে লাগলো

সাহিত্য, তারপর আর কিছু। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই তার প্রধান দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রানুগামী যুগের প্রমথ চৌধুরী এরপর আনলেন আর একটা জিনিষ—রবীন্দ্রনাথের অব্যক্তিক ভাবমুখিতা এবং অতি-অলঙ্করণকে তিনি আর একটু সহজ করে, তাতে সঞ্চারিত করলেন একটি ঋজুতা। বাংলা কথ্য ভাষা নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই, রবীন্দ্রনাথ ও হাত দিয়েছিলেন এই পরীক্ষায়, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীই তাকে সর্ববিধ আলোচনার অনন্ত বাহন করে তুললেন। এই খান থেকেই আধুনিক গদ্যের সূচনা—এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। নানা বিচিত্র পথে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আজ তা হু-হু করে এগিয়ে চলেছে—বিচারে বিতর্কে, আলাপে আলোচনায়, রসে রসিকতায় তার সমৃদ্ধি আজ প্রচুরায়ত হতে চলেছে। আরো সৌভাগ্য যে প্রসঙ্গাত্মক গদ্য ও রসাত্মক গদ্যের ভেতর আজ সুস্পষ্ট একটা সীমারেখা গড়ে উঠেছে, যার ফলে বিষয়ভারাক্রান্ত সাম্প্রতিক রচনাকে আজ আর কেউ সাহিত্য বলে ভুল করেন না।

এই ক্রমোন্নতির পথেই বাংলা গদ্যে এসেছে নূতন একটা জিনিষ—ইংরেজীতে একে বলা হয় personal essay, বাংলায় বলা যাক ব্যক্তিক নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথেই আছে এর রূপ, প্রমথ চৌধুরীতে ও আছে—কিন্তু এর সত্যিকার উৎকর্ষ হয়েছে অতি আধুনিক কালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, সঞ্জীব চন্দ্র, নবীন সেন, চন্দ্রনাথ বসু এবং আরো কোন কোন লেখকের রচনায় এক ধরণের আত্মবীক্ষাসূচক নিবন্ধ দেখা যায়—যার উদ্দেশ্য সমসাময়িক জীবন ও তার পারিপার্শ্বিককে হাল্কা হাতে এঁকে যাওয়া এবং সেই অঙ্কনের মুখে তার ওপর নিজের মনের রং ফেলে চলা। বলা বাহুল্য ব্যক্তিক নিবন্ধের প্রাথমিক কাঠামো এই—কিন্তু এরি সঙ্গে চাই একটা সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গী, যা না থাকলে শিল্প হিসাবে রচনা কোন রকমেই দানা বাঁধতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের আগে ঠিক সেই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী খুব সুলভ ছিল না, তাই এদিক থেকে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য ও হতে পারেনি তাঁর আগে।

আধুনিক কালে যাঁরা এই দিকে লেখনী চালনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল ও বুদ্ধদেব বসুর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এঁরা তিন জনেই জোর দিয়েছেন বিশেষ করে ভ্রমণের কথা লেখার ওপর—পথে বিপথে চলতে ফিরতে যে সমস্ত ছবি চোখে পড়ে, যে সমস্ত লোক এসে পড়ে হাতের সামনে, যে সমস্ত ছোটখাটো ঘটনা ঘটে তার ভেতর দিয়ে নিজের মনের অনুভূতিগুলোকে আলতো আলোয় ফুটিয়ে যাওয়াতেই তাঁদের হাত খেলেছে খুব ভালো। বুদ্ধদেব এ ছাড়াও লিখেছেন ব্যক্তিক নিবন্ধ—যাতে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং প্রাত্যহিক সংসারে অনেক সময় উপেক্ষণীয় জিনিষ তাঁর মনের আলোতে রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে। এই হল খাঁটি জাতের personal essay র দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এখানেও আছে একটা ছোট আপত্তি। এতটা রং কেন? প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে রঙের জৌলুসে আবিল করে তুললে স্বভাবতঃ লেখক পাঠকের অনুরাগের ওপর দাবীদার হয়ে ওঠেন, কিন্তু এই রংকে সংহত করে তুলতে পারলেই তাঁর দ্বারা সম্ভব সত্যিকার বিচারের সম্মুখীন হওয়া। এই দিক দিয়ে সম্প্রতি একজন লেখক খুব বড় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—তিনি হলেন জ্যোতির্ময় রায়।

এর আগে গল্প লেখায় নিজস্ব বৈশিষ্টের পরিচয় দিয়ে তিনি ভালো করেই প্রমাণ করেছেন যে তাঁর চোখে দৃষ্টির অভিনবতা এবং হাতে প্রকাশের সাবলীলতা আছে। তারি রকম ফের দেখলাম তাঁর নূতন প্রবন্ধের বই 'দৃষ্টিকোণে'। এই বইটি শুধু বাজারেরই নূতন বই নয়, সাহিত্যক্ষেত্রে ও নূতন। যে সমস্ত

বিষয় ও বস্তুকে, যে ধরণের দৃষ্টি দিয়ে আমরা নিত্য নিয়ত দেখেছি বা দেখি—তাদের তিনি এমন একটা বিশেষ দিক থেকে দেখেছেন এবং এঁকেছেন যে প্রথমেই তাঁর দৃষ্টির অভিনবতায় তাক লেগে যায়। কিন্তু তার পরও আছে। শব্দপ্রয়োগ এবং পরিবেশ অঙ্কনে তাঁর এই দর্শন ও মননের সঞ্চয় এমনি জমাট বেঁধে উঠেছে যে অকপটে বলতে হয় চমৎকার। এই চমৎকার কথাটা ইদানীং আমাদের সাহিত্যে রেখে ঢেকে বলা চলছে, তার কারণ সত্যিকার নূতন লেখকের আবির্ভাবকে আজ আমরা ভয় করতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু আমার কোন ভয় নেই—সহজ ভাবেই বলছি চমৎকার, ঠিক এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আমি একটাও বাংলায় পড়িনি—এমন ধার, এমন জৌলুস, সবদিক থেকে এমন নূতনত্ব সচরাচর সুলভ নয় বলেই বলবো, লেখক সার্থক শিল্পী।

বলা বাহুল্য বইটির আমি বিশদ সমালোচনা করছি না। তাই এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা আমার প্রয়োজন হয় নি। এমন কি দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যে সমস্ত প্রসঙ্গাত্মক রচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন, তার কোন কোনটার সঙ্গে রীতিমত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, আমি সেগুলোর কথাও তুলি নি। যে সমস্ত অজ্ঞাত অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে তিনি সাহিত্যের উঁচু তলায় উন্নীত করেছেন—যেমন 'ইনসমনিয়া', 'কড়া', 'বেকার বনাম ইন্সুরেন্স এজেন্ট'—শুধু সেইগুলোকেই আমি আমার আলোচনার লক্ষ্য স্বরূপ নিয়েছি। ইংরেজীতে পড়েছি এই জাতের লেখা অনেক—বাংলায় এর অভাব চিরদিন ছিল, আশা হচ্ছে এবার দূর হবে। সেই ভাবী সম্ভাবনার অগ্রদূত রূপেই আমি স্বাগত করছি শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়কে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

"নিজেরে হারায়ে খুঁজি"—শ্রীগীতা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার, মাধব চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা, দাম ১৷৵০। ১৫০ পৃষ্ঠা

বাংলা সাহিত্যের আসরে আমরা লেখিকাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। লেখিকা নূতন এবং উপন্যাসটী তাঁর প্রথম লেখা। কিন্তু তাই বলে তার লেখনী মোটেই অপটু নয়। লেখিকার রচনা শক্তি আছে, কল্পনা শক্তি আছে আর আছে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রতিভা। ভাষা ঝরঝরে ও জোরদার এবং আতিশয্য নেই কোথাও। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে গল্পাংশ অতি সামান্য। মাতৃপিতৃহীনা মেয়ে, বিলিতী ভাবাপন্ন বড়লোক পিসিমার দ্বারা প্রতিপালিতা ও উচ্চশিক্ষিতা। ড্রইং রুমের কৃত্রিম জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পালিয়ে সে ভবঘুরে বেদের দলে যোগ দিলো এবং ছ'মাসের অজ্ঞাতবাসের পরে কলকাতায় এসে বিয়ে থা করে সংসারী হল। প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কৃত্রিম জীবনের এবং বেদে বেদেনীদের যাযাবর জীবনের চিত্র খুটীনাটী সহ বিবৃত হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ এবং রোমান্টিক একটা সুগভীর চিত্তের দুর্দম্য অতৃপ্তি এবং অফুরন্ত উদাস। শিক্ষিতা আধুনিকার ঘাঘরা পরে ছমাস বেদেনী জীবন যাপন অবাস্তব মনে হবে। তবু বইখানা আমাদের ভাল লেগেছে।

'দীপঙ্কর'

নীতি এবং কৌশল, মানুষ ও মানচিত্র ভীড় কোরেছে এর মস্তিষ্কে——
"ওয়ার্লড রিভিউ হইতে"

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ "বিশ্ববন্ধু"

১৭ই অক্টোবরের খবরে জানা যায় মস্কোর পতন আসন্ন; রাজধানী কাজানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মস্কো পতনের জন্য শুধু রাশিয়ানরা কেন বাইরের জগৎও প্রস্তুত ছিল। এই সেদিন লর্ড বিভারব্রুকের মুখে শোনা গেছে—'মস্কোর পতনে রাশিয়ার পরাজয় ঘটিবে না'। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দূত হ্যারি হপকিন্স রাশিয়া পরিদর্শন ক'রে ওয়াশিংটনে ফিরে বলেছেন রাজধানী সরিয়ে নেবার প্রয়োজন হলেও রাশিয়ার প্রতিরোধশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে আমেরিকান সাংবাদিক র‍্যালফ্ ইন্‌গারসল আঙ্কারা থেকে খবর পাঠিয়েছিলেন 'রাশিয়া অপরাজেয়'।

জার্মাণীও জানে মস্কো পতনেই রাশিয়ার পতন নয়। রাইখের প্রেসবিভাগের বড়কর্তা ডিট্রিস ৯ই অক্টোবর পূর্ব সীমান্ত থেকে বার্লিনে ফিরে এসে বলেন 'রণকৌশলের দিক দিয়ে বলা যায় সোভিয়েট রাশিয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে।' ২রা অক্টোবর হিটলার অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ব-রণাঙ্গন থেকে নাৎসীপার্টির বাৎসরিক সভায় যোগ দিয়ে পূর্ব-রণাঙ্গনে আর একবার তুমুল জার্মাণ আক্রমণের খবর পৃথিবীকে জানিয়ে দেন। এটা হোল জার্মাণীর চতুর্থ অভিযান। এই অভিযানের চতুর্থ কি পঞ্চম দিনেই ডিট্রিস ঘোষণা করেছেন' 'Soviet Russia is finished from the military point of view'. রাজধানী হিসাবে মস্কোর মর্যাদা কিম্বা শীতের পূর্বে মস্কো পৌছানর সার্থকতা জার্মাণীর জানা আছে। কিন্তু জার্মাণীর সমরবিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে ভোরোশিলফ্, টিমোশেঙ্কো ও বুদেনীর সেনানী। এবার সেইজন্যই জার্মাণী প্রথমটা তিনদিন প্রকাণ্ড চক্রাকারে মস্কোর চারিদিকে সৈন্যচালনা করে হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে বর্শাফলকের মত মস্কোর দিকে ছুটে চলেছে। গত সেপ্টেম্বরে ব্রিয়ান্‌স্ক পর্যন্ত জার্মাণরা পৌচেছিল। এবারকার আক্রমণে ভালদাই পাহাড় থেকে ব্রিয়ানস্ক পর্যন্ত বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করলেও ভিয়াজমা রণক্ষেত্রেই জার্মাণরা প্রবল হয়ে টিমোশেঙ্কোর বাহিনী খণ্ডিত করবার দাবী করে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যোজনব্যাপী ফ্রন্টের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলা কিম্বা পেছু হঠা যেমন রুশদের সব চাইতে লক্ষ্যের বিষয়, জার্মাণরাও তেমনি অখণ্ড সীমানায় ফাটল ধরিয়ে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একে একে ঘেরাও করে পিষে মারবার জন্য বদ্ধপরিকর। আক্রমণের সপ্তদশ সপ্তাহে বুঝিবা তাদের বাসনা পূর্ণ হোয়েছে। রাইখের প্রেস বিভাগের কর্তা ডিট্রিসের হিসাব অনুযায়ী টিমোশেঙ্কোর ৫০ থেকে ৭০ ডিভিসন বাহিনী দুইটি ব্যূহে আট্‌কা পড়ে গেছে। ডিট্রিসের ঘোষণায় বলা হয়েছে বুদেনীর বাহিনী দক্ষিণে নিকাশ হয়েছে, ভরোশিলফেরটা লেনিনগ্রাদে বেষ্টিত হয়ে আছে—অর্থাৎ গোটা সোভিয়েট ফ্রন্টই চুরমার হয়ে গেছে।

জয়শ্রী

৯ই অক্টোবর তারিখে হিটলারের দৈনিক নির্দেশপত্রে (order of the day) যে উক্তি ছিল তার সবটাই যে ফাঁকা আওয়াজ অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। হিটলার তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'গত তিনমাসের মধ্যে তোমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত শত্রুর সমরশিল্পের কেন্দ্রগুলি দখলে এনেছ, আরও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার তিনটি সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র তোমাদের হস্তগত হবে। এই যুদ্ধে রুশ হতাহত ও বন্দী ২৪ লক্ষ, ১৭,০০০ ট্যাঙ্ক, ২১,০০০ বন্দুক ও ১৪,০০০ বিমান ধ্বংশ অথবা দখল করেছ। তোমাদের সঙ্গে আজ উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ফিন, স্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, ইতালীয়ান, রুমানিয়ান সৈন্যদল শত্রুর জমিতে লড়াই করছে, স্প্যানিশ ক্রোট এবং বেলজিয়ান বাহিনী শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে।" মস্কোর পথে মোজালিস্ক, রাসলভ, ওরেল, টুলা, কালিনিন এবং কালগা এই স্থানগুলি অনায়াসে না হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই যে ভাবে জার্মাণ কবলে এসেছে তাতে হিটলারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কমুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা' ও সেই কথাই বলেছে। 'প্রাভদা' শঙ্কিতচিত্তে জার্মাণীর সংখ্যাধিক্য স্বীকার করে বলেছে—শত্রুসৈন্যের ক্ষতি প্রচুর হলেও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি না করা অমার্জনীয় লঘুচিত্ততার পরিচায়ক হবে।

অন্ত দুই সমর ক্ষেত্রের মধ্যে লেলিনগ্রাদে লড়াইয়ের হারজিৎ অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বল্টিকে রেড নেভি যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় লেলিনগ্রাদ সমুদ্রপথে সুরক্ষিত আছে। সোভিয়েট নৌবহর এখনও ওয়েসেল, ভারো এবং হাঙ্গোতে ঘাঁটি আগলে আছে।

রুমানিয়ান সৈন্য ওডেসা দখল করেছে। দক্ষিণে খারকভের পথে পোল্টাভা দখলের সংবাদ পাওয়া গেছে। খারকভ ইউক্রেনের শিল্পকেন্দ্রের অন্যতম। খারকভের পথ খোলা পেলে ইউক্রেনের সমৃদ্ধতর প্রদেশে প্রবেশ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। ইউক্রেনের অন্য কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র যেমন কিয়েফ, নিপ্রোপেট্রোভস্ক, খারসান ও ক্রিভয়রগ জার্মাণদের হস্তগত। জার্মাণীর দক্ষিণ অভিযানে ডনবেজ শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রবল চেষ্টা চলেছে।

জার্মাণরা আজব সাগরের তীরে মোলটোপাল, বার্ডনিয়াস্ক মারিয়াপোল, টাগানরগ দখল করেছে। টাগানরাগের ৪০ মাইল দূরে রোষ্টভ বন্দর বিপন্ন।

ক্রিমিয়ায় জার্মাণরা পেরেকোপ অঞ্চলে সংগ্রাম করছে। ক্রিমিয়ায় সেবেস্তাপুল রাশিয়ান অধিকারে থাকা পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে রুশ-শক্তি প্রবল থাকবে। কিছুদিন পূর্বে বুলগেরিয়ায় সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে। কৃষ্ণসাগরে রুশ আধিপত্য খর্ব করার জন্যই এই আয়োজন মনে হয়। বুলগেরিয়ার বন্দরে যে সামান্য নৌবল আছে তা রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নৌবলের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং ইতালীয় নৌবলের সহায়তায় রুশীয় নৌবলের শক্তি ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া জার্মাণীর অন্য উপায় নাই। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে দার্দনেলিসের মধ্য দিয়ে ইতালীয় নৌশক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে তুর্কিকে রাজী করাতে হবে। বুলগেরিয় সমাবেশের অন্তরালে তুর্কিকে সম্মত করবার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় যে নাই সেকথা জোর করে বলা চলে না। বুলগেরিয় সমাবেশের আতঙ্ক তুর্কি-সম্মতি আদায় করতে না পারলে তুর্কি অভিযানের সম্ভাবনাও আছে।

মধ্য প্রাচ্য

থাইবার আর তেহেরান যেন এক দৌড়ের পথ। ভারতের জঙ্গীলাট ওয়াভেল সাহেব লণ্ডন থেকে ফিরবার পথে তেহেরাণ ঘুরে এসেছেন। সুইডেনের কাগজ 'সোসিয়াল ডেমক্রেটেন' এর খবর,

ককেসাসে সৈন্য পরিচালনার উদ্যোগ চলেছে—ভার পরেছে ওয়াভেল সাহেবের ওপর। পার্সীয়ান উপসাগরের বন্দর বন্দরসাপুরের সৈন্য নেমে রেলপথে ইরাণ যাচ্ছে; থাইবার পাশ থেকে যাচ্ছে সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমান। ইরাণের শাহের রেলপথটা খুব কাজে লেগে গেল। এই সুবিধা থাকায় তাব্রিজের উত্তরে একটা ব্রিটিশ ঘাঁটি রাখা চলবে। দক্ষিণ-রুশের তেলের খনি নিয়ে জেনারেল ওয়াভেল ও মার্শাল ফন রুন্‌স্তেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে—কে কার আগে দখল করবে। সেইজন্যই এই তোড়জোড়। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বিমান মহড়া চলেছে—লড়াই যদি ককেসাসে আসে?

বিশ্ব শান্তি

লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে শান্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়। আবার তার পরই জোড় লড়াই শুরু হয়। "Cannibal Hitler" শান্তির চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়েছেন কারণ "War-monger" চার্চিল তার শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। হিটলারের লড়াইয়ের সমস্ত আয়োজন 'are the most important preparations for peace' শান্তির নৈবেদ্য রচনা, আর চার্চিলের 'আটলান্টিক চার্টারের' প্রতি ছত্রে ছত্রে বিশ্বশান্তির জন্য উদ্যুতা। আমরা অহরহ একথাই শুনছি, লড়াইয়ের পূর্বে দুনিয়া যা ছিল আর লড়াইয়ের পর দুনিয়া যা হ'বে তার মধ্যে থাকবে আসমান-জমিন তফাৎ। পৃথিবীর এই অবস্থায় একটা দুরন্ত বিরোধের অবসান ঘটে নূতন কোন্ ব্যবস্থার মাঙ্গলিক ধ্বনিত হবে তা বলা কঠিন কিন্তু একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। "The price of victory is a European revolution for we can not unleash the forces that victory requires if we stand by the ancient ways." (Laski, Where do we go from here, p126). 'ancient ways' অথবা 'প্রাচীন পন্থা'র অপমৃত্যু লাস্কি সাহেবের স্বগোত্রীয়রা কামনা ও ভাবনা কোনটাই করেন না, তা আর নজীর দিয়ে দেখাতে হবে না। যুদ্ধ জয়ের জন্য ল্যাস্কি সাহেব যে চড়া দাম হেঁকেছেন তার চাইতেও কম দরে জয়ের পথ খোলা ছিল। সে পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠেছে, সুতরাং যারা সাদা চোখে দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখেন, ল্যাস্কি সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন "without that revolution both the war and the peace will be no more than a dispute about the character of a social order which has twice brought us to world conflict and will bring us to it again if we seek no more than its preservation." সাম্রাজ্য আঁকড়ে থাকা যাদের স্বভাব তাদের কাছে লাস্কি সাহেব কি আশা করেন?

এই সেদিন ইডেন সাহেব লণ্ডনে এক মৈত্রী সম্মেলনে—'Inter Allied Conferrence'—এক 'স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' ইউরোপ রচনা করলেন। যুদ্ধের পর নাৎসী নির্যাতন থেকে যে সব দেশ উদ্ধার পাবে মৈত্রী সম্মেলন তাদের খাবার ও জীবন যাত্রার অন্যান্য অপরিহার্য দ্রব্যের সংস্থান দেবে। খাবার যোগাবে আমেরিকা। আমেরিকার যোগানে আর ইংরেজের মোড়লীতে খাবার বিলি করেই ইডেন সাহেব ভাঙ্গা ইউরোপ জোড়া লাগাবেন, এটা ল্যাস্কি সাহেবের 'revolution' এর কোন সংস্করণ?

শ্রেণী সংগ্রাম বনাম জাতীয় সংগ্রাম—

শ্রেণী সংগ্রাম না জাতীয় সংগ্রাম? প্রশ্নটা স্বভাবতই আসে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ কৌতূহলের সামগ্রী। আমেরিকার সাহায্য পেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আর সেই সাহায্যের দাবীতেই সোভিয়েটের সামনে নানা রকম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে—'ধর্মের

স্বাধীনতা রাশিয়ার আছে কি'? উপায় নাই—সোভিয়েটের প্রচার কর্তা মঃ লজভস্কি ও লণ্ডনস্থ দূত মঃ মেইস্কি আমেরিকার প্রশ্নকর্তাদের আশ্বস্ত করেছেন—সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন চার্চ, আছে ধর্মের স্বাধীনতা আছে এবং ধর্মটা হ'ল ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, অবশ্যি ধর্মবিরোধী প্রচারেরও স্বাধীনতা আছে। কথায় বলে 'He who pays the piper 'all for the tune.' সোভিয়েট নিরুপায়—শ্রেণী মহৎ কিন্তু জাতি মহত্তর। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই ধরণের একটা অবস্থার কথা চিন্তা করেই লিখেছিলেন সোভিয়েটের শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়। (The allies of the Soviet government must not be troubled by revolutionary or anti-militarist propaganda, but must be supported in all the turns and twists of their international politics. The war by which the objects of Communism are to be achieved thus ceases to be a class war as formerly conceived and becomes an ordinary war between national states—Which way to peace, p 195)

নিরপেক্ষতা আইনের সংশোধন—

আতলান্তিকের ক্রমবর্ধমান জাহাজ ডুবিতে আমেরিকার ধৈর্যের বাঁধ বুঝিবা ভাঙে। পর পর আটটা জাহাজ সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হয়েছে। অষ্টম জাহাজ আই, সি, হোয়াইট ডোবার পর তুমুল কলরব উঠেছে নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন করে সওদাগরীগুলি জাহাজগুলি সশস্ত্র করবার জন্য। স্বরাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল মনে করেন সাবমেরিন অভিযানের মূলে আছে আতলান্তিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা। নিরপেক্ষতা আইনের বিধানে কোন কোন স্থানে আমেরিকার জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু সাবমেরিন আক্রমণের ফলে সমগ্র আতলান্তিকই নিষিদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। সে অবস্থায় 'Lease and Land' এর সাহায্য বৃটেনে পৌছাবে না। এই অবস্থা দূর করবার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আইন সংশোধনের সুপারিশ করে কংগ্রেসে পাঠিয়েছেন। আই, সি, হোয়াইট ডুবি বোধ হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পথ সুগম কোরে দেবে। Isolationist অর্থাৎ যারা আমেরিকাকে ইউরোপের ঝঞ্চাটের বাইরে রাখতে চায় তাদের দলে আনা এরপর সহজ হয়ে যাবে! সেই দলেরই একজন রেমণ্ড ক্ল্যাপ্পার এই আইনের আগাগোড়া সংশোধন দাবী করে বলেছেন 'আইনে মানা আছে আমেরিকার জাহাজ কোন যুদ্ধমান বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না—বৃটেনের যে কোন বন্দরে আমেরিকার জাহাজ পাঠাবার স্বাধীনতা 'শাসন বিভাগ দাবী করে'। এই থেকেই মনে হয় সওদাগরী জাহাজের সশস্ত্রীকরণের পরই এই ধারার সংশোধন করা হবে।

পানামায় রাষ্ট্রবিপর্যয়—

এই ধারণটা যে অমূলক নয় পানামায় রাষ্ট্রবিপর্যয়ে সেটা বোঝা যায়। যে সব জাহাজ পানামার নিশান উড়িয়ে চলে পানামার ক্যাবিনেট তাদের সশস্ত্রীকরণ নিষেধ করে। এই খবর আলোচনা কালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র কমিটির সভাপতি সেনেটর কোনোলি মন্তব্য করেন "নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন করে আমরা বাণিজ্য জাহাজ সশস্ত্র করতে পারি এবং তারপর তাদের যে কোন অঞ্চলে পাঠাতে পারি"। অর্থাৎ পানামা ক্যাবিনেটের মর্জির ওপর নির্ভর না করে এবং পানামার নিশানের ভরসায় না থেকেও আমেরিকা আইন বদ্‌লেই নিজের নিশানের আড়ালে জাহাজ চালাতে পারবে।

এরপরই গত ৯ই অক্টোবর জানা যায় পানামার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে পানামার বিচার সচিব রিকার্ডো গার্ডিয়া শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। প্রেসিডেন্ট আরিয়াস জানিয়েছেন তিনি পলায়ন করেন নাই, চক্ষু চিকিৎসার জন্য হাভানায় গিয়েছিলেন সেই অবসরে এই ব্যাপার। পানামার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রবিপর্যয়ের কার্য কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সংসারে শুধু নাৎসী প্ররোচনাতেই কু'দেতা হয় না।

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের আভাস

সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠেছে। 'চীনের ঘটনা' গতমাসে সাড়া দিয়ে উঠেছে। জাপানীদের দক্ষিণ অভিযান প্রতিরোধ করে তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করে বিপদগ্রস্ত করার লোভ চীনারা সামলাতে পারে নি,—ফলে হুনান, হোনান, কোয়াংটাং, চেংচাও প্রভৃতি মধ্য চীনের প্রদেশ-গুলিতে চীন-জাপান সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেছে। এবারকার হানাহানিতে চীনদেরই জিৎ হয়েছে। চাংসা ও ইচাংএ নাকি জাপানীদের ৪০,০০০ সৈন্য নিকাশ হয়ে গেছে, মধ্য চীনে চীনা সৈন্যের বিজয় অভিযানে চীননেতারা চীনের অনুকূলে এই যুদ্ধের নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখছেন।

আমেরিকার 'লিজ এণ্ড লেণ্ড' আইনে চীনাকে সাহায্য করার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারল জন ম্যাগ্রডর এক মিলিটারী মিশন নিয়ে চুংকিং উপস্থিত হয়েছেন। পরস্বাপহারী দেশের বিরুদ্ধে সবরকম সাহায্য করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের পঞ্চম বৎসরে আমেরিকাবাসীদের হুকুমনামা চীনদেশে হাজির হয়েছে।

পরোপকারের বিলম্বিত অভিপ্রায়ের কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা ক্রমেই জটিল হয়ে এসেছে। প্রিন্স কোনয়ের মন্ত্রীসভা প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিল। সেই অবসরেই কর্ণেল নক্সের মন্তব্য আমেরিকা জাপান, জার্মাণী ও ইতালীকে পরাস্ত করবার সঙ্কল্প করেছে—শান্তি আলোচনা কতটা অর্থহীন তাই প্রমাণ করেছে। ফলে হয়েছেও তাই। কর্ণেল নক্সের মন্তব্যের পরই জাপানে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। জাপানী সাংবাদিকরা সেই সময়ই বলেন, যদি কর্ণেল নক্সের বক্তৃতার পর জাপানে কোন চরমপন্থী, জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন তজ্জন্য এই বক্তৃতাই দায়ী। তারপর ক্রমাগত পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে। 'জাপান টাইমস এণ্ড এডভাইসার' সোভিয়েট যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদান করার জন্য ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজকে সতর্ক করে দিয়েছে। গত তিন মাসে বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্য চীন থেকে মাঞ্চুরিয়ায় জমা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ সমবেতভাবে জাপানে তেল রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছে এবং এই প্রতিবন্ধক নাকি প্রাচ্যে সমৃদ্ধির সীমানা বিস্তারে জাপানীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে।

গত ১৬ই অক্টোবর কোনয়ে মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। কোনয়ে মন্ত্রীসভার অনুসৃত 'জাতীয় নীতি' নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়াই নাকি তাদের কার্যভার ত্যাগের কারণ। কোনয়ে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ বহুপূর্বেই আশাকরা গেছে, মধ্য চীনে জাপানের লাঞ্ছনা, ইউরোপে সোভিয়েটের দুর্বল অবস্থান, মিত্রশক্তিকে সাহায্যদানে আমেরিকার তোড়জোড়, সুদূর প্রাচ্যে ইংরেজের বিমান বিভাগের কর্তা স্যার ব্রুক পপ্ হামের

গফর, সবগুলি মিলে জাপানী নীতির পরিবর্তন আগম্ন হয়ে উঠেছিল। জাপানী রাষ্ট্রনীতিতে চক্রবৎ সামরিক ও বৈষয়িক প্রভাব দেখা যায়। কোনয়ে পরিষদ শান্তিজল ছড়িয়ে বৈষয়িক প্রভাবের মর্যাদা বৃদ্ধি করছিল। কিন্তু পর পর এতগুলি ঘটনার সংঘাতে আবার সামরিক প্রভাব জাপানী রাষ্ট্রনীতির আসন দখল করেছে। তাই কোনয়ে সভার সমর সচিব, নূতন দপ্তরের প্রধান মন্ত্রী।

নূতন মন্ত্রীসভার গঠন সুদূর প্রাচ্যে লড়াইয়ের আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। জল্পনা চলেছে আক্রমণটা কোথায় হবে। চাংসায় লাঞ্ছনা ভুলতে কি জাপান দক্ষিণায়নে যাবে? ভ্লাডিভাষ্টকের পথে আমেরিকা সোভিয়েট-সাহায্য পাঠাচ্ছে—জাপানী নৌবহরের নজর সে দিকেও আছে। মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ-সেটা ভুলেলেও চলবে না। তিনমাস পূর্বে কোনয়ে সভা পদত্যাগ করলে সাতদিনের মধ্যে জাপানী সৈন্য ইন্দো-চীনে প্রবেশ করে—এটাও মনে রাখবার বিষয়। মোটকথা, ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকিয়ে জাপান তৈরী—টোজো সভা তারই ইঙ্গিত। অভিযান কোথায় এবং কখন হবে রাষ্ট্রনীতির দূরবীণ দিয়ে তারই নিরিখ চলবে এখন।

১৮-১০-৪১

ব্লাড-ভিটা

আদর্শ টনিক

রক্ত নির্মল ও সতেজ করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষাগারে বিভিন্ন রসায়নের গুণাগুণ নির্ণীত ও প্রশংসিত।

ভিটামিন "বি,"
আয়রন,
ক্যালসিয়াম্
ম্যাঙ্গানিস
ও
ফসফেট
ইত্যাদি মিশ্রিত।

স্নায়বিক দৌর্বল্য,
রক্তাল্পতা,
কোষ্ঠ-কাঠিন্য,
গাউট,
রিউমেটিসম্,
ও
সন্তান-সম্ভব্যার
পক্ষে বিশেষ
ফল-দায়ক।

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী

পি, ২৩, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা।

সম্পাদকীয়

ভারত ও ব্রহ্মদেশে নির্বাচন বন্ধ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় নির্বাচন স্থগিত বিল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হোয়েছে—এ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্যেরা যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা খুবই উপাদেয়। আমেরী সাহেব বিল উত্থাপন কোরে বলেন যে বিলটীতে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরও এক বৎসর ভারত ও ব্রহ্মদেশে নির্বাচন বন্ধ রাখবার প্রস্তাব করা হোয়েছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে এখন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে গেলে—যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়বে—২য়তঃ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলেছে, নির্বাচনে তা আরো বাড়বে ; ৩য়তঃ, কতকগুলো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছাড়ার ফলে শাসন-তন্ত্র স্থগিত রয়েছে এখন নির্বাচন হোলে—গান্ধিজীকে যুদ্ধের প্রতি নেতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে।

শ্রমিক সদস্য—সিলভারম্যান, কোভ, সোরেনসেন বিলের বিরুদ্ধে বলেন যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে একইরূপ ব্যবস্থা করবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নাই—ইংলণ্ডের কমন্স সভা নির্বাচন স্থগিত রেখেছে, কিন্তু ভারতীয় আইন পরিষদগুলি এর স্বপক্ষে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই—কমন্স সভা জোর কোরে নির্বাচন স্থগিত রাখছে—বিলে যুদ্ধকালে ও যুদ্ধের পরও ১২ মাস নির্বাচন বন্ধ রাখা হোচ্ছে—কিন্তু এর আগে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হবে না বা যুদ্ধের ১২ মাসের পরও যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটবে না, নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। মিঃ সোরেন সেন বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট যেহেতু জানেন যে ভারতবাসীরা তাঁদের নীতি সমর্থন করছে না, সেজন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হোচ্ছে—যদি এর উল্টো হোতো তবে নির্বাচন বন্ধ রাখা হোতো না।

লর্ড উইন্টারটন ও ষ্টেন্‌লী বিলটাকে সমর্থন কোরে যা বলেন তার মর্ম—ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক প্রীতিকর নয় সত্য, কিন্তু তার জন্য ভারতবর্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কিছু বাধা পড়ছে না এবং বিলটা আনাতে স্বেচ্ছাচারিতা, প্রকাশ পায়নি, কারণ কমন্সের সঙ্গে ভারতবর্ষের যা শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক তাতে এ ধরণের বিল আনবার অধিকার কমন্সের রয়েছে। ব্যাস্ ; চুকে গেল অধিকার যখন রয়েছে—তখন কোন ওজর আপত্তি খাটে না। সে অধিকার গায়ের জোরের অধিকার না—তার পেছনে কোনো জনমত রয়েছে তা বিচার কোরে দেখবার প্রয়োজন নেই। ফ্যাসিস্তবাদের নিন্দা ও ডিমোক্রেসী এবং স্বাধীনতার ডঙ্কানিনাদ করতে করতে অধিকারের জগন্নাথ রথ ভারতবর্ষের

উপর দিয়ে চালিয়ে নেবার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। কিন্তু এই ১৯৪১ সনে ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোনো অধিকার আশা করেন এমন রাজনৈতিক—বীর সভরকার ও মিঃ জিন্না—বাদে কেউ আছেন কি? কাজেই আমাদের অন্যপথে মুক্তি খুঁজতে হবে—সে পথ কোন দিক দিয়ে কি ভাবে আসবে তা সুস্পষ্ট হয়তো নয়—কিন্তু তার ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই আসছে—সে ইঙ্গিতকে ভারতের জনগণের নিকট সুস্পষ্ট কোরে তোলা এখন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের একমাত্র কাজ।

আমেরিকার পাঁচটী প্রশ্ন

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনৈতিকেরা ভারতের স্বপক্ষে আমেরিকার ওকালতিতে অত্যন্ত আস্থাবান। তাঁরা মনে করেন যে বৃটেনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমেরিকা যখন ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তখন—আমেরিকার সুপারিশ বৃটেন ফেলতে পারবে না। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন ভদ্রলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচটী প্রশ্ন কোরেছেন সে প্রশ্ন কয়েকটী আলোচনা করে একদিকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকার পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে আমেরী সাহেবের উত্তরে চমৎকৃত হোতে হয়।

প্রশ্ন পাঁচটী এরূপ:—

(১) ভারতবর্ষ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কি কি ট্যাক্স দিয়ে থাকে?

(২) ভারতের বড়লাট ভারতের জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণ না কোরেই সত্যই কি জার্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন?

(৩) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিচ্ছেন না কেন? তাঁদের কি দেবার ইচ্ছা আছে? কখন?

(৪) ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়াই যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি হয় তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কারাদণ্ডের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কোথায়?

(৫) বর্ত্তমান যুদ্ধ—ভারতে বৃটিশ রক্ষা ব্যবস্থার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কি পরিবর্ত্তন এনেছে? এর উত্তরে আমেরী সাহেব বলছেন ভারতবর্ষ তো কোনো টেক্স দেয়ই না বরং বৃটিশ সরকারকে ভারত রক্ষার জন্য বৎসরে কয়েক কোটি ডলার দিতে হয়।

বড়লাট যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি কারণ তাঁর সে অধিকার নেই, বৃটেন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধভাবেই ভারত যুদ্ধে অংশীদার হোয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে একতা স্থাপিত হোলেই তা দেওয়া হবে। পণ্ডিত জওহরলাল বিশিষ্ট ব্যক্তি হোলেও আইনের উপরে নন। আর যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতবর্ষের মতামত কি তা প্রমাণ হবে ভারতবর্ষ থেকে স্বেচ্ছায় সাড়ে সাত লক্ষ লোক সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়েছে এই তথ্য থেকে।

যেমন প্রশ্ন তার উত্তরও তেমনি।

হোমচার্জ নামে প্রতি বৎসর ভারত থেকে ৫০ কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে—সেটা মার্কিনী বন্ধুরা অবশ্যি একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, তবে সে কষ্টস্বীকার তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না—আর এই যুদ্ধে সাহায্য করবার ব্যাপারে ভারতের স্বাধীন মতামত কি তা জানাও সহজ। কিন্তু এই প্রশ্ন-উত্তরে ভারতের পক্ষে লাভ লোকসান কিছু নেই। নিছক পরোপকারের খাতিরে আদর্শ রক্ষার জন্য, কোনো দেশ স্বাধীনতার ফলটী ইংরেজের কাছ থেকে আহরণ কোরে এনে ভারতবাসীর হাতে দেবে সে স্বপ্ন কেউ দেখে না।

ভারতের রেল

ভারতে রেল লাইন প্রবর্ত্তিত হয় প্রধানতঃ ইংরেজের সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য—যাতে শান্তি (?) রক্ষার ব্যাঘাত ঘটলে সহজে সায়েস্তা করা যায় শান্তিভঙ্গকারীদের। কাজেই ভারতবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত বা সুবিধা অসুবিধার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—ইংরেজের প্রয়োজনে ভারতের রেল অন্যত্র চালান যাবে তার আর আশ্চর্য কি? কাজেই সম্প্রতি ই, আই, আর এ, উইক-এণ্ড টিকিট বন্ধ করে দেওয়া হোয়েছে, পূজার সময় যাত্রী সংখ্যা বাড়াবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায়ও মন্দা লেগেছে—এমন কি পূর্বাহ্ণেই জানানো হোয়েছে এবার কুম্ভমেলায় অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়া সম্ভব হবে না। ক্রমশঃ যে ট্রেনের সংখ্যা আরো কমানো হবে তার ইঙ্গিত সর্বত্র। এর কারণ ভারতকে যুদ্ধমান মধ্য-প্রাচ্যে রেললাইন গাড়ী ইত্যাদি চালান দিতে হোয়েছে সেখানকার প্রয়োজন মেটাতে—হয়তো এর পর ইরাণের রেল লাইনের স্বল্পতা দূর কোরতে ভারতকেই ডেমক্রেসী রক্ষার্থে স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া যেসব মেরামতি কারখানা ছিল তাতে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী হোচ্ছে—ভারতে ইঞ্জিন তৈরীর যে পরিকল্পনা হোয়েছিল যুদ্ধের জন্য তা পরিত্যাগ করা হোয়েছে—যুদ্ধের কাজ কোরেই কারখানাগুলো কুল পাচ্ছে না—ভারতবাসী ২।৪ বছর না হয় যাতায়াত নাই করলো—তাতে স্বাধীনতা ও ডেমক্রেসীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কাজেই এদেশে রেললাইন, গাড়ী, ইঞ্জিন সব কিছুর অভাব হোয়েছে, আরো হবে। স্বাভাবিক যাতায়াত বন্ধ হবে, বাণিজ্য বন্ধ হবে ফলে জিনিষের দাম আরো বাড়বে—তা ছাড়া মেরামতের অভাবে রেল লাইন, ইঞ্জিন ইত্যাদির অবস্থা বিপজ্জনকও হবে—কিন্তু তাতে আশঙ্কান্বিত হবার কি আছে—না হয় ডিমোক্রেসী রক্ষার্থে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে—কয়েক শত "কালা আদমী" রেল এক্সিডেণ্টে মারা যাবে। উদ্দেশ্য তো সাধু!

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ অমরনাথ ঝাঁর সভাপতিত্বে নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনের ১৭শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে

ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা সম্মিলিত হন এবং অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা হয়, তার দু একটী উল্লেখ করবো—

আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ঐক্য বৈঠকে সিন্ধুর শিক্ষা সচিব পীর ইলাহী বক্স বলেন, "আমরা মুসলমানগণ ভারতবাসী, আমরা ভারতবাসী হিসাবেই বাঁচিয়া থাকিব এবং ভারতবাসী হিসাবেই মরিব।" তিনি বলেন ভারতকে তার নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করতে হবে এবং শিক্ষকদের তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচার করতে অনুরোধ করেন। বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলী কি বলেন এ বিষয়ে? ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা চান না, তাঁরা চান হিন্দু অথবা মুসলমানী শিক্ষা-পদ্ধতি। শিক্ষার গায়েও তাঁরা 'হিন্দু' 'মুসলমান' ইত্যাদি তকমা এটে দেবার পক্ষপাতী—আর তা না করলেই ছেলেমেয়েরা যথার্থ হিন্দু ও যথার্থ মুসলমান হোতে পারবে না।

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দান সম্পর্কে অধ্যাপক অনাথনাথ বসু বলেন "প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার প্রধান কাজ সভ্যতাকে যুদ্ধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার কবল হোতে উদ্ধার করা"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সব দেশে শিক্ষিতের হার অনেক উচ্চে তাদের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে বেশী। তিনি ঠিকই বলেছেন "প্রাপ্ত বয়স্কদের কোনো সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিলে তাদের মন থেকে পুরাতন বৈরীভাব দূর হবে না।"

"প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা রাষ্ট্রের শিক্ষা বিষয়ক দৈনন্দিন কার্যতালিকার অংশ হওয়া উচিত"·····"এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার চূড়ান্ত কার্যতালিকা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের এক সম্মেলনে রচিত হওয়া আবশ্যক। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্র ও যুবকদিগকে নির্দিষ্ট সময় কাজ কোরতে বাধ্য করা উচিত।"

ভারতবর্ষের মত নিরক্ষর দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যে একটী প্রধান দায়িত্ব সে কথা সর্বস্বীকৃত কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের সে দায়িত্ব বোধ নেই এবং তাকে বাধ্য করাবারও কোনো উপায় নেই। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা—বিষয়টীর গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি পড়ে মাত্র কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না। তবু এ সম্মেলনগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দেশের সামনে আমাদের লক্ষ্যকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে।

জওহরলালকে কুইসলিং আখ্যা

কুরুচি ও স্পর্ধা কতদূর যেতে পারে—তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে নাগপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ জি এফ ফারকুহারের ব্যবহারে। ব্যাপারটী এই।

যুদ্ধের প্রচারকার্য চালাবার সময় একদল লোক গান্ধীজীর জয়ধ্বনি ও মিঃ ফারকুহারকে নানারূপ প্রশ্ন করে—তাতে উত্তেজিত হয়ে তিনি জওহরলাল নেহেরুকে "কুইসলিং" অভিহিত করেন। পরে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি ক্ষমা

প্রার্থনা করেছেন দেখে আমরা খুসী হোয়েছি। তবে এ ব্যাপার নূতন নয়—বিদেশী শাসকদের অযাচিত উপদেশ ও ভর্ৎসনা দুইই শুনতে আমরা অভ্যস্ত।

হরদয়াল নাগ জয়ন্তী

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলার প্রবীনতম দেশসেবক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের ৮৮তম জয়ন্তী উৎসব চাঁদপুরে সুসম্পন্ন হয়। তিনি কংগ্রেসের জন্ম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলন হোয়েছে সব কয়টিতেই সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ কোরেছেন—প্রতি যুগের রাজনৈতিক মত ও পথের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন এ কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তাঁর মধ্যে যে জীবন্ত মন ও সজীব প্রাণ রয়েছে জরাগ্রস্ত দেহদ্বারা অভিভূত হোয়ে পড়েনি—তাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর এই নিষ্ঠা ও মানসিক শক্তিকে আমরা দেশের সামনে আদর্শ হিসাবে ধরছি। আদর্শ লাভের জন্য এই যে গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা—এ আমাদের দেশে দুর্লভ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্বন্ধে এসেম্বলীর বিরোধীদলের সঙ্গে আপোষ মিমাংসা ব্যর্থ হোয়েছে। আমরা অন্যরূপ আশা করিনি। সাম্প্রদায়িকতার ঠুলি পরে যাঁরা সব কিছু দেখেন তাঁদের কাছে কোনো বৃহত্তর আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর আশা করা মূর্খামি—তবে বেশী দিন এভাবে চলবে না এই যা আশা—কারণ সমস্ত দেশকে বড় কোরতে না পারলে দেশের কোন একটী অংশ যে বড় হোতে পারে না এ অভিজ্ঞতা তাঁদের হবেই। আন্তর্জাতিক এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও এঁরা তাঁদের নীতি বদলাচ্ছেন না, এর পরিণাম যে কি অনুমান করা কঠিন নয়।

এই বিল সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীর মনোভাবের প্রতিবাদ করবার জন্য হাজরা পার্কে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হয়। শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল জাতীয় দৃষ্টি ও ভাবধারার পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করা হয়। আর একটী প্রস্তাবে এই বিল যেন আর অগ্রসর করা না হয় তার দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট করা হয় এবং সদস্যদের এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান করা হয়, তৃতীয় প্রস্তাবে জনমতের বিরুদ্ধে যদি এই বিল পাস করা হয় তবে হিন্দু জনসাধারণ ও বিশেষভাবে হিন্দু মন্ত্রীদের মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে অসহযোগ করতে বলা হয়। জনমত যারা গ্রাহ্য করেনা এসব প্রস্তাবে তারা বিচলিত হবে না।

কামাথের বিবৃতি

চার্চিলের আটলাণ্টিক ঘোষণা সম্পর্কে নিখিলভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠনকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কামাথ—এক বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে কয়েকটী সত্য কথা রয়েছে। তিনি যথার্থই

বলেছেন' চার্চিলের ঘোষণাতে যদি ভারতের জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয় এবং যদি ভারত ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে তবে এই ঘোষণাতে শুভফল হোয়েছে বলা যেতে পারে। আর বৃটিশ শ্রমিকদলের সম্পর্কেও যদি ভারতীয়দের দৃষ্টি খোলে তবে আশার কথা।···চার্চিলের বক্তৃতা থেকে এও বোঝা যায় যে বৃটেন একটা স্বাধীন জাতীর সহযোগিতা অপেক্ষা একটা পরাধীন জাতির আত্মসমর্পণে বেশী বিশ্বাসী।·····যে সব ভারতবাসী বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে আমেরিকাবাসী বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এবং এর ফলে আমেরিকার আধ্যাত্মিক সমর্থন ভারত লাভ করবে—আর আমেরিকার সাহায্যের উপর যখন বৃটেনের ১৬ আনা নির্ভর না করে উপায় নেই তখন আমেরিকার মতামত বৃটেনকে প্রভাবান্বিত করবেই। তাঁদের সাধের তাসের ঘর এখন খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে—কারণ চার্চিলের বক্তৃতার পর আমেরিকা একটী কথাও বলেনি, বলবে তার আশাও নেই।

সৈন্যদের জন্য কম্বল

সম্প্রতি নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের সিন্ধু শাখা সৈন্যদের জন্য গভর্ণমেণ্টকে কম্বল সরবরাহ করে। এ নিয়ে দেশে কিছু আলোচনার সৃষ্টি হয়। গান্ধিজীর পক্ষথেকে মসরুওয়ালা এবং 'খাদি জগতে' গান্ধীজী নিজে এর যা উত্তর দিয়েছেন তার সার মর্ম—

(১) আমরা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পরোক্ষে যুদ্ধে সাহায্য না কোরে পারিনা—যখন আমরা ডাক টিকিট কিনি, রেলে চড়ি বা পেট্রোল কিনি তখন যুদ্ধে সাহায্য করি। যুদ্ধে সহযোগিতা না করতে হোলে বিদ্রোহ করতে হয়—কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের রূপ সেরকম নয়।

(২) বর্তমান আন্দোলনে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত করবার জন্য কোনো পিকেটিং করা হয় নাই কাজেই এ আন্দোলনে কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়া পর্যন্তই চলবে।

(৩) ক্রয়-বিক্রয় একটী আদান প্রদান, এটা চাঁদা দেওয়ার মত নয়। জিনিষ কিজন্য ব্যবহার হবে সেটা দেখা বিক্রেতার কাজ নয়। ক্রেতাদের বৃত্তিদেখে জিনিষ বিক্রী করা চলে না এবং তা সম্ভবও নয়।

(৪) 'গভর্ণমেণ্টকে' বিব্রত না করার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে এবার। কিন্তু যদি কোন ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার মতভেদ জেনে কোনো কোনো জিনিষের খুব দরকার থাকা সত্ত্বেও তা বিক্রি না করা হয় তবে বিব্রত করার নীতিই গ্রহণ করা হয়।

মহাত্মা গান্ধির নিজের ও তাঁর তরফ থেকে মসরুওয়ালার যুক্তি দেখে মনে হয় যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধির মারপ্যাচ দ্বারা স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞানকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করা যায় এ তার একটি চমৎকার উদাহরণ। ভারতবর্ষে বাস কোরে ও জীবনধারণ কোরেই আমরা পরোক্ষভাবে শুধু যুদ্ধে নয়—সাম্রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করছি কিন্তু তার জন্য যেমন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার

আন্দোলন অর্থহীন বা অযৌক্তিক নয়—তেমনি কোন অধীন দেশের অধিবাসীদের পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে সাহায্য করিয়ে নেওয়া হোচ্ছে এই অজুহাতে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করার যুক্তি সমর্থন করা যায় না। প্রথমোক্ত স্থলে choice এর কোনো সুযোগ নেই শেষোক্ত স্থলে ইচ্ছা না কোরলে সাহায্য না কোরেও পারা যায়।

তারপর—বিক্রেতা ক্রেতার বৃত্তি কি দেখতে পারে না যখন ক্রেতা বিক্রেতা ব্যক্তি বিশেষ individuals হয়, কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতা যেখানে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেখানে সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যিক আদান প্রদানের নয়, সেখানে নীতির প্রশ্ন আসে। আর সে নীতি শুধু সাক্ষাৎ ভাবে অস্ত্র শস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। আজ মহাত্মা গান্ধি, জাপানের নিকট কম্বল বিক্রী করিবেন কিনা বা তাঁকে করতে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা সকলের নিকট নির্দোষ মাল বিক্রী করতে পারবেন না, সেখানে নীতির দিক দিয়ে কোনো একটি বিশেষ বিক্রেতার নিকট মাল বিক্রী করা অর্থপূর্ণ হয়।

তারপর বিব্রত না করার নীতি—এ নীতিকে আমরা কখনো সমর্থন করি নাই তবু মহাত্মা গান্ধিরই বিব্রত না করবার নীতি অর্থে আমরা বুঝেছি এতদিন যে এমন কোনো আন্দোলন তিনি করতে চান না, যাতে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যুদ্ধমান বৃটেন বিপদাপন্ন হয়, তার সঙ্গে কম্বল বিক্রী না করার দ্বারা বিব্রত করবার ব্যাপার সমপর্যায় ভুক্ত নয়। কম্বল বিক্রী না করলে বৃটেন কিছুমাত্র অসুবিধাগ্রস্ত হোতো বলে আমাদের বিশ্বাস নয়—এ যেন সহযোগিতা করবার জন্যই সুযোগ গ্রহণ, অন্ততঃ সাধারণের সে ধারণা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মহাত্মা গান্ধির এসব সূক্ষ্ম ethical যুক্তি আমরা রাজনীতিরক্ষেত্রে কোনোদিনই প্রযোজ্য বলে মনে করিনি—কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক সময় ভ্রান্তির সৃষ্টি করে—তার জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতের রাজবন্দী

পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীসমস্যা চির পুরাতন। যাঁরা দেশের ক্লেশ মোচনের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহশীল তাঁদের জন্য বন্দীশালার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। বন্দীশালাতেই জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের কাটাতে হবে এ নিশ্চয়—কিন্তু তবু দেশবাসী তাঁদের ভুলতে পারে না—তাঁদের অভাব অভিযোগকে সাধারণে প্রকাশ করতেই হয়।

সম্প্রতি মিঃ এম এন যোশী দেউলী বন্দী নিবাস পরিদর্শন কোরে রাজনৈতিক বন্দীদের কতকগুলো অভাব অভিযোগের বিবরণ দিয়েছেন—সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রেণী বিভাগ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাতা সম্পর্কে অভিযোগ।

শ্রেণী বিভাগ নিয়ে রাজবন্দীরা চিরদিন আন্দোলন করেছে—তবু গভর্ণমেণ্টের নীতির

পরিবর্তন হয় নি—এই শ্রেণীবিভাগের কি যে প্রয়োজন বোঝা মুস্কিল। যখন এদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে স্বীকার করা হোচ্ছে, তখন তাদের একই শ্রেণীভুক্ত যে কেন করা হবে না তার স্বপক্ষে খেয়াল ছাড়া কোনো যুক্তি নেই। এদিকে জিনিষের মূল্য যত বাড়ছে রাজনৈতিক বন্দীদের ভাতার পরিমাণ তত কমছে।

এ ব্যাপার মন্দ নয়—প্রথম এক টাকা ছিল তারপর পনোর আনা ও এখন বার আনা করা হোয়েছে আর পারিবারিক ভাতাও কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া হোচ্ছে না। যার যার প্রদেশ থেকে এত দূরে যাতায়াতের পক্ষে কঠিন এরূপ স্থানে বন্দীদের রাখবার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও বন্দীরা বহু অভিযোগ কোরেছে। এদের যদি বন্দী কোরে রাখাই গভর্ণমেণ্টের মর্জি হয় তবে অন্ততঃ এদের প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কোনো সভ্য গভর্ণমেণ্টের নীতি হোতে পারে দেখে আমরা বিস্মিত হোয়েছি। যা হোক্ রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নীতির কোনো পরিবর্তন আমরা আশা করিনা যদিও বড়লাটের কাউন্সিলের নবনিযুক্ত মহারথীরা অনেক আশা দিচ্ছেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির ১৯৪০—৪১ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হোয়েছে। রিপোর্টে বলা হোয়েছে যে ১৯২০ সনে ছাত্রদের স্বাস্থ্য যা ছিল ১৯৪০ এ তার অপেক্ষা উন্নতি হোয়েছে। ছাত্ররা অধিকতর দীর্ঘ সুগঠিত দেহ ও সুস্থ হোয়েছে। ১৯২০ সালে প্রথম ছাত্র মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়—এবং তখন পরীক্ষা কোরে দেখা যায় শতকরা ৬৬ জন ছাত্রছাত্রীই কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত। ১৯৩৫-৩৭ এই তিন বৎসরে এই সংখ্যা শতকরা ৪০ জনে নামে কিন্তু ১৯৩৮—৪০এ এ আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ জনে উঠে। এবার ১৯৪০—৪১ এ যে অনুকূল রিপোর্ট প্রকাশিত হোয়েছে তার স্বপক্ষে ছাত্রমঙ্গল সমিতি বলেছেন যে—সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময় বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় না কাজেই দৃষ্টি শক্তির অভাব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যহীনতার বিষয়ও ধরা হয় নাই। এগুলি বিচার করলে ছাত্রমঙ্গল সমিতির রিপোর্ট অনুরূপ হোতো ১৯৩৮—৪০ সালে দৃষ্টিশক্তির অভাব জনিত রোগ ৩৩ থেকে ৩৭ এ উঠেছে—এবং ছাত্রীদের মধ্যেই এই রোগের প্রসারতা বেশী বলে জানা গেছে—ছাত্রদের সংখ্যা যেখানে ৩৫' ৫. ছাত্রীদের সংখ্যা ৪১' ৩. টনসিলের রোগে ছাত্র ভুগছে কলেজে ৬'৪ স্কুলে ১৭'৯. আর ছাত্রীদের সংখ্যা ২৮। দাঁতের রোগে আক্রান্ত ছাত্রদের সংখ্যা ১'৪ আর ছাত্রীর সংখ্যা ২'৩। কিন্তু যদিও এ সকল তথ্যথেকে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীদের স্বাস্থ্য খারাপ প্রমাণ হয় কিন্তু—অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে—ছাত্রমঙ্গল সমিতির অভিমত যে ছাত্র ও ছাত্রীর স্বাস্থ্যের বিশেষ তারতম্য নেই। তাছাড়া এই রিপোর্ট কলকাতার কয়েকটী মাত্র স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর তৈরী—যথার্থ তথ্য পেতে হোলে সমস্ত বাংলাদেশের স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয় এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি এদিক দিয়ে সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে জাতির ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকরী ভাবে সাহায্য করবেন। আমরা আশা করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিক দিয়ে পথ প্রদর্শন করবেন।

সাম্রাজ্যের প্রগতি

"আমেরিকায় আমরা যা করেছিলাম—আয়র্লেণ্ডে তাই করছি—আয়র্লেণ্ডে যা করে-ছিলাম—মিশরে তাই করছি—এবং প্রতিবারই সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী অশ্রু বিসর্জ্জন করেন" * নিউ ষ্টেটস্‌মেন ও নেশান নামক বিলাতী সাপ্তাহিকের ৯ই আগষ্টের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে সাম্রাজ্যের প্রগতির উপরোক্ত ধরণের একটা ফিরিস্তি—প্রবন্ধ লেখক দিয়েছেন। প্রবন্ধ লেখকের আফ্‌শোষ গত ১৭০ বৎসর যাবৎ ইংরেজ সাম্রাজ্য খোয়াচ্ছেন যেমন আজ ভারতবর্ষকে খোয়াতে বসেছেন লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ও আমেরী সাহেব। দীর্ঘসূত্রী ইংরেজের বিলম্বিত ব্যবস্থায় অবস্থা নাকি এমন এসে দাঁড়ায় যখন আর 'সবজেক্ট'দের মন ভোলাবার সময় থাকে না—স্বয়ং-শাসনের বায়না ধরে হাতে হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা রুখে দাঁড়ায়। লড়াইয়ে পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে তবুও ইংরেজের নাকি এই খামখেয়াল দূর হয় নাই; জাঁক করে সাম্রাজ্যের পসরা সাজিয়ে বসতে তাদের প্রচুর প্রয়াস।

সাম্রাজ্যবাদীর খেয়াল সবাই সমান বুঝতে পারেন না, ইতিহাসও সবার কাছে একইভাবে ধরা পড়ে না—তাই আটলাণ্টিকের চুক্তিপত্র নিয়ে এত উত্তাপ ও মনস্তাপ। ভারতবাসীর হ'য়ে দুচার জন ইংরেজ ভদ্রলোক ওকালতি করেছেন দেখে একই কারণে আমরা কেউ কেউ পুলকিত হোয়েছি।

এ প্রসঙ্গে সার সেকেন্দারের দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে চার্চিলের ঘোষণায় তিনি বিশেষ মর্মাহত হোয়ে তিনসপ্তাহের মধ্যে বৃটিশ সরকারের নিকট একটী সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করেন বৃটিশ সরকারের উপর তাঁর এই পূর্ণ বিশ্বাসে অবশ্য আমাদের কোনো আপত্তি নেই—তবে যদি উত্তর মনের মত না হয় তবে তিনি কি করবেন সে সম্পর্কে তিনি নীরব কেন?

সার সেকেন্দারের ঘোষণার দাবী সম্পর্কে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স এক বিবৃতিতে বলেন যে সার সেকেন্দার যে ঘোষণার দাবী করেছেন তার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, যে সব জাতি গভর্ণমেণ্টকে এই যুদ্ধে সহায়তা করছে তাদের জন্য অনুকূল বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটী প্রতিশ্রুতি পাওয়া। এতে অবশ্যি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোনো আপত্তির কারণ নেই এবং সানন্দে তারা এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে কারণ ভেদনীতির উপরই তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত এবং এ ব্যবস্থাতে সেই ভেদনীতিরই জয় হবে। খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের বিবৃতির উত্তরে সার সেকেন্দার এ কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলেছেন যে দেশের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিরা একটী সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন, যদি এই প্রতিনিধিরা তা না করতে পারেন তবে ভারত রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের যে সকল শ্রেণীগুলি যুদ্ধে সাহায্য করছে তাদের সহযোগিতায় একটী শাসনতন্ত্র রচনা করা হবে। মোট কথা তিনি যে ঘোষণা দাবী করেছেন সাম্রাজ্যের শক্তি তাতে বৃদ্ধিই পাবে, কমবে না—এখন দেখা যাক তাঁর এই দাবীর উত্তরে চার্চিল কি বলেন?

* 'We do in Ireland what we did in America, in Egypt what we did in Ireland and now in India what we did in Egypt. And every time the Imperial angels weep'.

জয়শ্রী

ভারতীয় রাজনীতির ঘানী

সম্প্রতি কংগ্রেসের জনকয়েক মহারথী মুক্তি পেয়েছেন—তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু গুপ্ত, আসফালী এবং গোবিন্দ বল্লভ ও আছেন। এঁদের মুক্তিতে আবার ভারতের রাজনৈতিক public opinion মুখরিত হোয়ে উঠেছে নানা জল্পনা-কল্পনায়। তাছাড়া মাদ্রাজী নেতা সত্যমূর্ত্তির ওয়ার্দ্ধা-নাসিক-মাদ্রাজ দৌড়াদৌড়ি রাজনৈতিকদের চমৎকৃত কোরেছে। নাসিকে ও বোম্বেতে তিনি দেশাই ও সর্দারজীর সহিত দেখা করেছেন ও বহু গোপন বৈঠকের খবরও পাওয়া গেছে। এইসব বিচিত্র ঘটনা পরম্পরার মধ্যথেকে কয়েকটি প্রশ্ন সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে।

প্রথমতঃ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যাঁরা মুক্ত হোয়েছেন, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ যাঁরা জেলে আছেন এবং স্বয়ং গান্ধিজীর মতকি ?

২য়তঃ যদি সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অনুকূল মত না হয়, তবে নীতির পরিবর্ত্তন কি ভাবে হবে ?

যাঁরা মুক্ত হোয়েছেন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তাঁরা পরিষ্কার কোন মতামত প্রকাশ করেননি যা করেছেন তা সরকারী ভাবে সত্যাগ্রহকে সমর্থন করে। মৌলানা আজাদ সম্পর্কে যদিও শোনা যাচ্ছে তিনি এই সত্যাগ্রহে সন্তুষ্ট নন এর সম্প্রসারণ চান, তবু প্রকাশ্যে তিনি এ অস্বীকার করেছেন এবং সত্যাগ্রহের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন।

গান্ধীজীর মতামত সরকারীভাবে জানবার এখনো আমাদের সুযোগ হয়নি—কিন্তু তিনি সত্যাগ্রহ সম্প্রসারণ করতে বা এ বন্ধ করতে রাজী নন বলেই মনে হয়—তিনি বলেছেন সত্যাগ্রহীদের অসুস্থতা না ঘটলে বার বার কারাবরণ করতে হবে। কাজেই তাঁর মতামত অনুমান করা কঠিন নয়।

ওদিকে সত্যমূর্ত্তির মত যে যুদ্ধ ও জাতীয় অচল অবস্থা সম্পর্কে ভারতবাসীর মতামত কি তা আইন পরিষদের বাহির ও ভিতর উভয় স্থান থেকে প্রচার করা উচিত। আইন পরিষদে যোগ দিলে সে সুযোগ পাওয়া যাবে। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় কাজেই আইন পরিষদে যোগদান এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণ এ দুইই তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু যতদূর জানা গেছে গান্ধিজী এ যুক্তি স্বীকার করেননি—করে সত্যমূর্ত্তিকে নাকি তাঁর মতামত প্রচার করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা ভাবছি এই মতামতের স্বাধীনতা দাবী করেই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হোয়েছিল—শুধু তাই নয় তাঁকে সমর্থন করার ফলে গোটা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেই বাতিল করা হোয়েছিল ন্যায় ও সত্যের খাতিরে। আজ গান্ধীজী তার কি কৈফিয়ৎ দেবেন। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অপেক্ষা সত্যমূর্তিকে কি বেশী প্রয়োজন ?

এদিকে শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঞা ইফতিকার উদ্দিন মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করবেন, উদ্দেশ্য কংগ্রেস-লীগ মিলন সংঘটিত করা—এ খবর কতদূর সত্য জানা যায়নি—তবে অসম্ভব নাও হোতে পারে। কাজেই সেই "থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়'। মুরছে ভারতের রাজনৈতিক ঘানি—স্তিমিত তার গতি, বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জিত তার নীতি, ভাগ্য চক্র এগিয়ে আসছে তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই তার চোখে ঢুলিদিয়ে ঘানি ঠিকমত চালালেই হোলো।

লোক গণনা

অবশেষে বাংলাদেশের লোকগণনার ফলাফল জানতে পারা গেছে। এই গণনা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হোয়েছে—প্রত্যেক দলই নিজেদের সংখ্যা যাতে উর্ধদিকে থাকে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছেন—কিন্তু এত করবার পরও ফল যা দাঁড়িয়েছে তাকে ১৯৩১ এর পুনরাবৃত্তি বল্লেই হয়। ১৯৩১এ কংগ্রেস থেকে সেন্সাস বয়কট করা হয়—তখনও যা ফল এখন ১৯৪১এ যখন গণনা যাতে নির্ভুল হয় তারজন্য গলদঘর্ম হোয়ে উঠলো সব দল তখনও সেই একই অবস্থা। ১৯৩১এ ছিল অনুপাত হিন্দু—৪৩·০৪, ১৯৪১এ ৪৩·৮, মুসলমান ছিল ৫৪·৮৭ এবার হয়েছে ৫৪·৭৩। হিন্দু-মুসলমান কোনো পক্ষই এই অঙ্কের সংখ্যাকে স্বীকার কোরতে রাজী নন—এ বিষয়ে তাদের ঐক্য আদর্শ স্থানীয়, এর ফল কি হয় দেখা যাক।

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি সংখ্যা কিন্তু ভারতবর্ষে এ সংখ্যা-নির্ণয় সম্পর্কে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সেন্সাসের কাজ নির্ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরে একটী স্থায়ী সেন্সাস বিভাগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যাতে কতক-লোকের এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জন্মাবার সুযোগ হয়। এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে প্রতি বছর নূতন কোরে লোক নেওয়া হয়—এবং যারা পূর্বে সেন্সাস কার্যে অংশ গ্রহণ করবার দরুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রকার পরিবর্তিত পন্থা আমরা আশা করি না—কিন্তু জনসাধারণকে সেন্সাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গলায় মন্ত্রীমণ্ডলী

হক-জিন্না মতান্তরের ফলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাকে storm in a tea-pot আখ্যা দিলে যথার্থ হয়। কারণ হক সাহেব মিঃ জিন্নাকে আক্রমণ করার জন্য প্রাদেশিক মুস্লীম লীগ হক সাহেবের কার্যের নিন্দা করে এবং মিঃ জিন্নার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কোরে প্রস্তাব পাশ করে। ফলে হক সাহেবের সঙ্গে লীগপন্থীদের লেগে যায় ভাল ভাবেই—হক সমর্থকরা মিঃ হুরাবর্দীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসময়ে এসেম্বলী স্থগিত রাখবার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তারপর যবনিকার অন্তরালে নানা পটপরিবর্তন চলতে লাগলো—রাতারাতি 'প্রোগ্রেসিভ এসেম্বলী পার্টি' এবং 'নবযুগের' আবির্ভাব হোলো হক সাহেবকে সমর্থন দেবার জন্য। ওদিকে লীগেরও তোড়জোড় চল্ল। যখন 'নবযুগের' নূতন বার্তা শোনবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হোয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় দেখা গেল হক সাহেব 'তোবা' 'তোবা' করতে সুরু কোরেছেন—তাঁর নেতৃত্বে মুস্লীম লীগের প্রাদেশিক বৈঠকে জিন্নার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কোরে প্রস্তাব গৃহীত হোলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল্পনা কল্পনারও অবসান হোলো—রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যারোমিটার একেবারে শূন্যে এসে নামলো। তবে এখনো অনেকে আশা ছাড়েন নি—

তাঁরা বলছেন হক সাহেবের এ একটা চাল, এর পর আরো কিছু ঘটবে। অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলী পরিবর্তন হবেই। যাদের পেছনে কোনো আদর্শের বালাই নেই—কোনো প্রকারে ক্ষমতাকে করতলগত কোরে রাখাই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহসিকতা অথবা দূরদৃষ্টি আশা করা বাতুলতা।

ঢাকার দাঙ্গা

গত ৫ই অক্টোবর ঢাকায় আবার দাঙ্গা সুরু হোয়েছে এবং নানা স্থান থেকে হতাহতের সংবাদ আসছে। দাঙ্গার কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু আমরা ভাবছি এ ভাবে চলবে কতদিন, গভর্ণমেণ্ট কি নিরপেক্ষ হোয়ে কেবল তাকিয়ে থাকবেন, না—হিন্দু-মুসলমান কলহের এই নজির দেখাবার সুযোগ গ্রহণ করবেন?

বহির্ভারতে যুদ্ধ ক্রমেই এগিয়ে আসছে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ক্রমে সঙীন হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে এই আত্মঘাতী কলহের যে কী ফল তা' সাধারণ বুদ্ধিতে শিশু ও বুঝতে পারছে। তবু বারম্বার এই লজ্জাকর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। গত বুধবার ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ঈদের মিছিল উপলক্ষে আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। বারবার একই মন্তব্য করে কোন ফল হবে না; তবু আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ইংরেজ সরকারের কি বিন্দুমাত্র চক্ষু লজ্জাও নেই, দায়িত্বজ্ঞানের আশা না হয় নাই করলাম!

জয়প্রকাশনারায়ণের পত্র

দেউলী জেল থেকে জয়প্রকাশনারায়ণের লিখিত একখানা বে-আইনী পত্র ধরা পড়েছে বলে ভারত সরকার ইস্তাহার জারি করেছেন। পত্রখানা নাকি পত্নীর নিকটে লেখা এবং গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রখানা শোনা যাচ্ছে ভারত সরকার ভারতের বাইরেও পাঠিয়েছেন। পত্রখানা নিয়ে এদেশে দস্তুর মত হট্টগোল হয়ে গেছে। গান্ধীজিকে পর্যন্ত বিবৃতি দিতে হয়েছে, কারণ জয়প্রকাশ তথাকথিত পত্রে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে বলেছেন এবং গান্ধীসত্যাগ্রহকে ছেলেখেলা বলেছেন। এদিকে জয়প্রকাশ আবার গান্ধীজীর প্রিয় সমর্থকও। গান্ধীজী স্বভাবতই বিব্রত বোধ করেছেন। পত্রখানার সত্যমিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছু বলবো না। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে হচ্ছে। পত্রখানার অন্তর্গত বক্তব্য অতি মামুলী, তবু সরকার একে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে এতটা হৈ চৈ সৃষ্টি কেন করলেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। এ কি আসন্ন দমন নীতির ইঙ্গিত, না, ডেটেন্যুদের দাবি-গুলোকে অগ্রাহ্য করবার ভূমিকা?

২২।১০।৪১